মরু-প্রদীপ

শ্রীঅশ্বিনীকুমার পাল, এম. এ.

প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস
৬১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক :
শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি. এ.
প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস
৬১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

দুই টাকা

মুদ্রাকর :
শ্রীগুরুদাস বসু
প্রবর্ত্তক প্রিন্টিং এ্যাণ্ড হাফ্‌টোন লিঃ
৫২।৩, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৯৪১ খৃষ্টাব্দে জাপানের সমরশক্তি বর্মামুলুক আক্রমণ করে, এবং ১৯৪২-এর প্রথম দিকে ইংরেজরা বর্মা ছেড়ে এদিকে পালিয়ে আসে। কিন্তু ইংরেজশাসক-শক্তির ভরসায় যে-সকল ভারতীয় এতকাল ধ'রে বর্মায় আশ্রয় নিয়েছিল, তা'রা নানাবিধ দুর্দশায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। সেই সময় লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী যারা বর্মাপ্রবাসী ছিল, তারা উত্তর-পশ্চিম এবং পশ্চিমের দুর্গম ও দুরারোহ পথে ভারতের দিকে অগ্রসর হ'তে থাকে। তাদের মধ্যে বহু বাঙ্গালী পরিবারও ছিল। 'মরু-প্রদীপ' বইখানির যিনি লেখক, তিনিও সেই পলাতক দলের মধ্যে অন্যতম ভদ্রলোক। বহু কষ্টে ও দুঃখের ভিতর দিয়ে তিনি বাঙ্গলায় ফিরতে সমর্থ হন্, এবং ফিরে এসে কোনো একটি মাসিক পত্রে তাঁর অভিজ্ঞতার বর্ণনা করেন। আমি তাঁর সেই রচনা পাঠ ক'রে বেদনা, উৎপীড়ন ও বিপর্যয়ের একটি বাস্তব চিত্র মনে মনে উপলব্ধি করি। সম্প্রতি অশ্বিনীবাবু তাঁর কয়েকটি রচনা একত্র ক'রে এই বইখানি প্রকাশ করছেন, সেজন্য আমি বিশেষভাবে উৎসাহবোধ করছি। তাঁর রচনায় ভাবাবেগের প্রাধান্য কিছু থাকলেও তাঁর রচনাশক্তিতে একটি সহজাত

অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। এই বইয়ের অন্যান্য গল্পগুলি সুপাঠ্য এবং কলাকুশলতায় সেগুলি সাধারণ পাঠকদের সুদৃষ্টি লাভ করবে, এই আমার বিশ্বাস। তিনি যদি তাঁর বর্মাপ্রবাসের অভিজ্ঞতাগুলি সযত্নে লিপিবদ্ধ করেন, তবে সেগুলির সাহিত্যমূল্য লেখকসমাজে অবশ্যই স্বীকৃত হবে।—

জ্যৈষ্ঠ ১৩, ১৩৫২ **প্রবোধকুমার সান্যাল**

সেদিন ছিল এমনি জ্যৈষ্ঠ মাস : চঞ্চল বালক বয়স : গ্রীষ্মতপ্ত আসন্ন সন্ধ্যায় 'বৈশাখী' আমতলায় আম কুড়োতে গিয়েছি ;—পাশেই বাবার শেষ শয্যাভূমি।—সেদিকে চেয়ে নীরব স্তব্ধ ব্যথিত প্রাণে বলে উঠ্‌লাম :

"কায়াহীন ছায়াহীন ভাষাহীন
মিশে গেছ ধরার ধূলায়—"

সেদিন থেকে প্রাণ জেগে রইল কী এক অজানার সন্ধানে। তারই কথা ব্যক্ত কর্‌তে চাইলাম কবিতায়, গানে, গল্পে ও প্রবন্ধে। আজ তারই পূজার প্রথম নিবেদন এই মরু-প্রদীপ।

দীর্ঘ রেংগুন-প্রবাসকালে চাকুরীজীবনের ফাঁকে ফাঁকে যে সাহিত্য প্রেরণা আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে, তারই প্রয়াসস্বরূপ এই গল্পগুচ্ছের সৃষ্টি। বর্তমান সামরিক-সভ্যতার চূড়ান্ত ধ্বংসাভিনয় ব্রহ্মদেশের শান্তিপূর্ণ ভূমিকে যেভাবে বিধ্বস্ত করেছে তারই আংশিক চিত্র আমার প্রথম গল্পে চিত্রিত করেছি। এ ছাড়া কয়েকটি বাস্তব অভিজ্ঞতাপ্রসূত গল্পও এতে সন্নিবদ্ধ হ'ল।

পুস্তকের অধিকাংশ গল্পই ভারতবর্ষ, বসুমতী, প্রবর্তক, আনন্দবাজার প্রভৃতি নানা মাসিক ও দৈনিক পত্রে পত্রস্থ হয়েছিল। কতিপয় বিশিষ্ট বন্ধুর সংপরামর্শে সেগুলি একত্র সমাবেশ ক'রে 'মরুপ্রদীপে' প্রকাশিত হ'ল। এই পুস্তক প্রকাশে যাঁরা আমাকে উৎসাহদান করেছেন, তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে প্রবর্তক-সম্পাদক শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত রাধারমণ চৌধুরী মহাশয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি স্বয়ং এই বইটির প্রকাশ-ভার না নিলে গল্পগুলি মাসিকের পৃষ্ঠা থেকে পুস্তকের পৃষ্ঠায় রূপান্তরিত হ'তো না। এজন্য তাঁর কাছে আমি চির কৃতজ্ঞ। এ-প্রসঙ্গে সুকবি ও নাট্যকার শ্রীযুক্ত দেবনারায়ণ গুপ্ত মহাশয়ের

নামও উল্লেখনীয়। তিনি আমাকে এ-বিষয় একাধিকবার উৎসাহদানে অনুগৃহীত করেছেন। বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার সান্যাল মহোদয় পুস্তকের একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় আমাকে যে উৎসাহ দান করেছেন, তা আমার পক্ষে একান্তই অভাবনীয় ব্যাপার। এজন্য কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এ-ছাড়া বইটির প্রচ্ছদ পট এঁকে দিয়েছেন চিত্রশিল্পী-কুশলা কুমারী রমা গুহ ও ছাপার যাবতীয় কার্য পর্যবেক্ষণ করেছেন বর্তমানের অন্যতম প্রসিদ্ধ গীতিকবি শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয়। এজন্য তাঁরাও আমার বিশেষ ধন্যবাদার্হ।

পরিশেষে আমার নিবেদন এই যে, পুস্তকাকারে 'মরুপ্রদীপ' প্রকাশ আমার জীবনের প্রথম প্রচেষ্টা; কাজেই অল্পবিস্তর ত্রুটী-বিচ্যুতির সম্ভাবনা আছে। গল্পগুলি যদি কারও মনোরঞ্জনে সমর্থ হয়, তা'হলে নিজকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করবো।

অশ্বিনী পাল

পরম শ্রদ্ধেয় "ভারতবর্ষ"-সম্পাদক

শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম. এ.

শ্রীচরণকমলেষু

ফণিদা',

বোমা-বিধ্বস্ত সুদূর বর্মা প্রদেশ থেকে যখন প্রাণভয়ে পায়ে-হাঁটা পথে বাংলাদেশে ফিরে আসি, তখন পথের শত বাধা-বিপত্তিকে ঠেলবার শক্তি দিয়েছিল আমার কবিমন। সেদিনের সেই পথের কাহিনীকে লিপিবদ্ধ করে যখন নিয়ে আসি আপনার কাছে, আপনি সেদিন যে উৎসাহ দিয়েছিলেন, উত্তরকালে সেই উৎসাহই আমার সাহিত্য-সাধনার পথকে সুগম করে দিয়েছে। তাই আমার প্রথম গল্প-গ্রন্থ সশ্রদ্ধচিত্তে আপনাকেই অর্পণ করলাম।

স্নেহধন্য

অশ্বিনী পাল

সূচী

মরু-প্রদীপ

ইভাকুইজ্ ফ্রম্ রেংগুন

স্বপ্ন। একটা বিরাট স্বপ্ন-সমুদ্রের প্রবাহস্রোতে ভেসে চলেছে সমস্ত সভ্যজগতের মানব-ইতিহাস! বর্তমান শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য ইত্যাদি যত প্রকার ব্যবস্থা রয়েছে মানব-চরিত্র গঠনের জন্য, তার মূলে রয়েছে দুঃখবাদ; উচ্ছৃংখল জীবন-স্বপ্ন। মানব-জীবনের মর্মভেদী করুণ আর্তনাদ। আজ প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে তারই বিষাদ ধ্বনি দিক্‌দিগন্তরে ধ্বনিত হচ্ছে।

১৯৪১। ২৩এ ও ২৫এ ডিসেম্বর বোমা-বরিষণের পর রেংগুনের ঘরে-বাইরে, রাস্তায় ঘাটে যে দৃশ্য দেখ্‌লাম, সে সব বলে' কোন লাভ নেই; তখন রেংগুন থেকে পালাতে পারলেই বরং লাভ। কিন্তু পালাতে চাইলে পালানো যায় না। কোন্ পথে পালাতে হবে? স্থলপথে, না জলপথে— এখন এ চিন্তাই বিপুল আকার ধারণ করে' সম্মুখে এসে দাঁড়ালো। তার উপর ন্যাশনাল্ ইন্‌ডিয়ান্ লাইফ অফিসে কাজ করি, অফিসের সমস্ত ভার আমার উপর। জেনারেল ম্যানেজার মিষ্টার বোসের কাছে টেলিগ্রাম করলাম কলকাতায়। জবাব এলো—প্রথম শ্রেণীর টিকেট করে' জলপথে সত্বর চলে' এসো, অফিসের দরকারী কাগজপত্র নিয়ে।

শুনতে পেলাম বংগোপসাগরে জাহাজ ডুবছে; ত্যাগ করলাম এ পথ। অফিসের দারোয়ান রামকিষণ ও পিয়ন মণীন্দ্রকে সংগে নিয়ে চলে' গেলাম চায়লট্। এখানে সংগী জুট্‌লো সতর-আঠারোজন। সুরেশ, বন্ধু ডাক্তার পালের স্ত্রী, তার ছেলেপুলে এবং হাসপাতালের

কম্‌পাউণ্ডারবাবু, তাঁর স্ত্রী শকুন্তলা দেবী ও তাঁদের ছেলেপুলে। বসির ও সৈব—দু'জন ভৃত্যও এলো।

১৩ই ফেব্রুয়ারী চায়লট্ থেকে আমরা ষ্টীমারে রওনা হয়ে' এলাম হান্‌জাদা। এখান থেকে আবার একটি বাংগালী পরিবার আমাদের সংগ ধরলো। ভদ্রলোকের নাম স্থধাংশুবাবু; সে নিজে, স্ত্রী, বয়স্থা মেয়ে—নাম গৌরী। আমাদের দল বেশ ভারী হয়ে উঠলো। হান্‌জাদা থেকে আবার ষ্টীমারে দু' দিনে এসে পৌছালাম প্রোম—রাত্রি এগারোটার সময়। অপরিচিত শহর; ব্ল্যাক-আউটের রাত; এতগুলি লোক নিয়ে কোথায় যাই? প্রোমে একজন পরিচিত বন্ধু ছিলো; অনেক খুঁজে তার বাসা পেলাম; বললাম—ভাই, পরের কতগুলি মেয়েছেলে সংগ ধরেছে, আজ রাত্রের জন্য তোমার এখানে স্থান হবে? কালই আবার এখান থেকে রওনা হবো। বন্ধুটি আগুনের মতো জ্বলে' উঠে আমাকে একপ্রকার তাড়িয়ে দিলে; তার বাসায় স্থান হবে না, রেংগুন থেকে নাগ-পরিবার এসে তার ওখানে উঠেছে; সে দুশ্চিন্তায় তার রাত্রে ঘুম আসে না, অনেকগুলি ছেলেপুলেও নাকি আছে; শহরে কলেরা লেগেছে, কখন কি হয় বলা যায় না; ইত্যাদি কারণে সে স্থান দিতে অক্ষম।

ফিরে এলাম। পথে এক বাংগালি ভদ্রলোকের সংগে দেখা হলো: তাঁকে সব বৃত্তান্ত খুলে' বললাম: শুনে তিনি বললেন, মেয়েছেলেরা এখন কোথায়?

ষ্টীমার থেকে নেমে নদীর পাড়ে বসে আছে।

ভদ্রলোকের দয়া হলো। নিজের স্ত্রী-পুত্র আগেই দেশে পাঠিয়ে দিয়েছেন। বললেন, আমি তো এখন মেসে থাকি: তবে আমার ঘরটা খালি আছে: এই নিন্ চাবি, চলুন আপনাদের ঘরে পৌছে দিয়ে আসি।

ভদ্রলোকের অনুগ্রহে অবশেষে স্থান পেলাম। কিন্তু সে রাতটা আমাদের ভয়ানক অশান্তিতে কাটলো। রাত একটার সময় চার-পাঁচজন

বর্মী এসে আমাদের সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করে গেলো। মনে হলো, এদের কোন দুরভিসন্ধি আছে। এদিকে চার-দিকে লুঠপাটের কথা শুনছি। তার উপর বন্ধুর কাছে শুনে এলাম কলেরার কথা: ছেলেপুলে আমাদের সংগেও একপাল।

একটু আলোর যোগাড় না করলে চলে না: সমস্ত অন্ধকার ঘরটা যেন গিলে খেতে চাচ্ছে।

সমুখের রাস্তায় একটা পানের দোকানে তখনও কোরোসিন লণ্ঠন জ্বলছে, কালো কাগজে ঢাকনি দেওয়া: আলো যেন বাইরে না পড়ে। সেখানে গিয়ে মোমবাতি পেলাম। একত্র চার-পাঁচটা মোম জ্বেলে ঘরে আলোর ব্যবস্থা করলাম। মেয়েরা সব ছেলেপুলে নিয়ে বসে আছে: সকলের মনেই বিষাদের ছায়া: কারো সংগে কথা বলতে সাহস হয় না। এদিকে ছেলেপুলের দল ক্ষুধা-তৃষ্ণায় ভয়ানক কান্না ও বায়না শুরু করে দিয়েছে: কিছু খাবার কিনতে গেলাম, কিন্তু কোথাও কিছু মিললো না, সব দোকান বন্ধ। ষ্টীমারের চায়ের দোকানে বিস্‌কুট দেখে এসেছি। ষ্টীমার-ঘাট এখান থেকে প্রায় এক মাইল, শর্টকাট করে একটা রাস্তায় ঢুকতেই কয়েকজন বর্মী এসে পকেটে হাত দিতে চাইলো; ভয়ে এতটুকু হয়ে গেলাম; সংগে ছিলো কম্‌পাউণ্ডারবাবুর ভৃত্য বসির; সেও এদের চেয়ে কম গুণ্ডা নয়। একজন বর্মীকে এক ঘুষিতে 'পপাত ধরণী তলে—' করে দিলো। বাকী সব দৌড়ে সম্মুখের আমবাগানে পালালো। অক্ষত পকেটে সেখান থেকে ষ্টীমারে গিয়ে বিস্‌কুট্ কিনলাম।

রাত্রে শোবার জন্য বিছানাপত্র কিছু নেওয়া হয়নি। বিছানা, ট্রাঙক্, সুট্‌কেস্ ও অন্যান্য মালপত্র নদীর পাড়ে নামিয়ে রাখা হয়েছে। রামকিষণ, মণীন্দ্র, সুরেশ আর সুধাংশুবাবু এঁরা ক'জন মালের কাছে বসে' মাল পাহারা দিচ্ছেন। এত রাত্রে কুলী মিললো না বলে' মালপত্র আজ এখানেই থাকবে স্থির হলো। সুরেশ, মণীন্দ্র আর সুধাংশুবাবুকে সেখানে

রেখে রামকিষণ ও বসিরকে বললাম—গোটা দুই বিছানা নিয়ে আমার সংগে আসতে। এসে দেখি প্রায় সবাই কাঠের মেঝের উপর ঘুমিয়ে পড়েছে। ছেলেপুলের গায়ের জামা খুলে' বালিশের পরিবর্তে মাথার নীচে দেওয়া হয়েছে; গৌরীর বালিশ একটা পিঁড়ি। এভাবে শু'লে নিশ্চয়ই মাথায় বেদনা হবে। পিঁড়িখানা সরিয়ে নিজের গায়ের শার্টটা খুলে' মাথার নীচে দিলাম। গৌরী ঘুমিয়ে পড়ে নি; চোখ মেলে আমার চোখে চাইলো; লজ্জা-অরুণ পরশে সহসা ওর মুখখানা যেন রাঙা হয়ে উঠলো; অধরপ্রান্তে ফুটলো করুণ রেখার হাসি। ডাক্তার পালের স্ত্রীর মাথা তার দক্ষিণ বাহুর উপর। কম্‌পাউণ্ডারবাবুর স্ত্রী শকুন্তলাদি' আর গৌরীর মা শুধু বসে। এঁদের বললাম, ডাকাডাকি করে' সবার ঘুম ভাঙ্গিয়ে লাভ নেই: রাত অনেক হয়ে গেছে: আপনারা এই বিছানা পেতে শুয়ে পড়ুন। বিস্‌কুট এনেছি, ছেলেপুলে তো ঘুমিয়ে পড়েছে; আচ্ছা থাক: ওদের জন্য রেখে দিন, কাল সকালে ঘুম থেকে উঠে খাবে। দিনকাল ভালো নয়, কলেরা লেগেছে। পরদিন সকালে উঠেই বাজার করতে গেলাম। চাল, ডাল, তরকারী যা পেলাম নিয়ে এলাম; লবণ পেলাম মাত্র দু' আনার, বেশী বিক্রী করবে না; তাড়াতাড়ি রান্নাবান্না করে' খেয়ে আবার রওনা হওয়ার যোগাড় করলাম। প্রোম নদী বয়ে' প্রায় পাঁচ মাইল দূরে গিয়ে নামতে হবে। একখানা বড় শাম্‌পান (ঐদেশী নৌকা) পঞ্চাশ টাকা দিয়ে ভাড়া করলাম, আগে এ জায়গাটুকু যেতে মাত্র দু' টাকা ভাড়া লাগতো।

নদী পার হয়ে যেখানে নামবো, তার নাম পাডাং; নদীর পাড়ে একটা মাঠ। এ পাডাং থেকে একশো দশ মাইল পাহাড়ের উপর দিয়ে হেটে গেলে টাংগুব পড়ে। এ রাস্তায় ভাত জল কিছুই পাওয়া যায় না। আমরা এক বস্তা চাল ও আনুষঙ্গিক মাল-মশলা কিনে নিলাম; জলের জন্য এগারোটা কেরোসিন তেলের টিনও এগারো টাকা দিয়ে

কিনে প্রোম নদী থেকে জল ভরে' শাম্পানে উঠলাম। নদীর পাড় থেকে মালপত্র এনে শাম্পানে উঠানো হয়েছে। তাতে কুলী খরচ লেগেছে পাঁচ টাকার জায়গায় পঁচিশ টাকা।

এ সময় আর একজন সংগী জুটলো—নিতাই। আমাদের সকলেরই পূর্বের জানা-শোনা। কম্পাউণ্ডারবাবু বললেন, ভালই হলো। মেয়েছেলে নিয়ে চলেছি। বিপদসংকুল পথ, আমাদের অনেকটা সাহায্যই হবে। আর ছোক্‌রার সাহসও আছে, শক্তিও আছে। একবার একজন বর্মীকে ও এক ঘুষিতে নৌকো থেকে জলে ফেলে দিয়েছিলো; বেশ সাহস! আমার তো সাহস বল কিছুই নেই। যা ছিলো এ যুদ্ধের ঠেলায় তাও আর নেই।

বেলা একটার সময় পাডাং এসে পৌছালাম। দেখলাম, প্রায় হাজার দুই লোক এখানে জমা হয়েছে; এখানে সেখানে পড়ে রয়েছে। ফাগুনের দুরন্ত রোদ সবার মাথার উপরে। সেই রৌদ্রতপ্ত মাঠের মধ্যেই কেউ কেউ রান্না করে' খাচ্ছে। আশেপাশে কলেরা রোগী, মৃত্যু-যাতনায় কেউ কেউ ছট্‌ফট্‌ করছে। কিন্তু সেদিকে কে চায়? সবাই ব্যস্ত যার যার জীবন নিয়ে; সকলেই আপন প্রাণের মায়ায় সচেষ্ট। এখান থেকে যত তাড়াতাড়ি পারা যায় সরে' পড়াই ভালো। আশেপাশের দৃশ্য দেখলে প্রাণ আতংকে ভরে' ওঠে। পীড়িত লোকদের মধ্যে প্রায় সবাই ছোট জাতির; মাদ্রাজী কুলীশ্রেণীর লোক। টাকা পয়সা সংগে কিছু নেই, শুধু পরণের কাপড়খানা সম্বল। সম্মুখের সুদীর্ঘ পাহাড়ী পথ হেটে পার হওয়া অসম্ভব ভেবে তারা আর এগুতে সাহস পায়নি। এখানেই দিনের পর দিন পড়ে' আছে। শেষে কলেরাক্রান্ত হয়ে কেউ মরছে, কেউ বা অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করছে।

এই একশো দশ মাইল পাহাড়ী পথ অতিক্রম করবার জন্য সেখানে গরুর গাড়ী পাওয়া যায়; কিন্তু ভাড়া অনেক! পঞ্চাশ-ষাট টাকা একখানা

গাড়ীর ভাড়া। পঞ্চাশ-ষাট টাকার কথা শুনে সুধাংশুবাবু দমে' গেলেন; তিনি হ্যান্‌জাদায় আবার ফিরে যাবেন; এতো টাকা তাঁর সংগে নেই; বললাম, চলুন টাকার জন্য ভাবতে হবে না।

সকলে মিলে সাতখানা গাড়ী করলাম; একখানা খাদ্যসামগ্রী বহন করে' নেবার জন্য। গাড়ীর মধ্যে দেড় হাত পরিমাণ উঁচু খড় বোঝাই; গরুর রাস্তার খাবার। তার উপরে বিছানা পেতে আমাদের বসবার জায়গা করলাম। উপরে কোনো ঢাক্‌নি বা ছই নেই। খোলা গাড়ী—আমাদের মালপত্রেই ভরে' গেলো। কাজেই বর্মী গাড়োয়ান ওদের ভাষায় গালাগালি করতে লাগলো এবং একখানা গাড়ীতে দু'জনের বেশী উঠতে দিতে চাইলে না, আমরা বাধ্য হয়ে আর একখানা গাড়ী করলাম। টাকার দিকে এখন চাইবার সময় নেই, যে পথে বের হয়েছি এবং যে দৃশ্য চক্ষের সামনে দেখছি, আর এক মুহূর্তও দেরি করা চলে না।

একত্র আটখানা গাড়ী চল্‌ছে মাঠের উপর দিয়ে, আমি একা একখানা গাড়ীতে উঠেছি, সকলের আগে চলেছে গাড়ীখানা, কারণ দলপতি আমি: কিন্তু বিপদের কথা কি বলবো, গরুর গাড়ীতে জীবনে কোনদিন উঠিনি। একটা জায়গা ভাংগা; গাড়ী সেখান দিয়ে যেতেই হুড়ুম করে' নীচে পড়ে' গেলাম; ভাগ্যি, হাত পা ভাংগে নি, তাড়াতাড়ি গা ঝাড়া দিয়ে উঠে আবার গাড়ীতে বসলাম; পিছনের ওরা দেখে সব হো হো করে' হেঁসে উঠলো, হাসলো না শুধু গৌরী; আমার ঠিক পিছনের গাড়ীতেই সে বসে, ডেকে বললো: লাগেনি তো? চুপ করে রইলাম: লজ্জায় যেন কিছু বলতে পারলাম না; শুধু সে "লাগেনি তো" ম্লান কণ্ঠস্বর আমার অংগে ভাষাময় ধ্বনি হয়ে বাজতে লাগলো।

রাত্রি বারোটার সময় একটা নির্জন কাশবনের ধারে এসে গাড়ী থামিয়ে দিলো। মেয়েরা গাড়ীর উপরেই বসে' রইলো; আমরা চা তৈরী করতে লাগলাম। ভয়ানক শীত পড়েছে, দাউ দাউ করে' আগুন জ্বেলে

দিয়েছি। সকলেই আগুনের চারিদিক ঘিরে বসলাম, বসির আর রামকিষণ চা তৈরি করে' গ্লাসে ঢেলে সকলকেই দিলো।

রাত্রি ভোর হ'তেই গাড়ী ছাড়লো। বেলা এগারোটার সময় এসে পৌছালাম একটা ছোট পাহাড়ের গায়। প্রকাণ্ড একটা কুলগাছ, তার নীচে গাড়ী রেখে রান্নার জোগাড় করা হলো। এখানে আরও কেউ কেউ রান্না করে খেয়ে গিয়েছে, হাঁড়ি, পাতিল ও ইটের উনুন পড়ে রয়েছে, একটু দূরেই তুলো-বের-হয়ে-পড়া বালিশ। শকুন্তলাদি' বলে উঠলেন, এখানে নিশ্চয়ই কেউ মারা গেছে, দেখছেন না ঐ ছেঁড়া বালিশটা ?

বললাম, মরণপথের যাত্রী আমরা সবাই, ভয় করলে চলবে না, এখানেই রান্না করতে হবে, এই উনুনেই। সামনে একটা কূয়া ছিলো, সেখান থেকে হাত মুখ ধুয়ে জল এনে রান্না করে' খেয়ে বেলা চারটের সময় আবার পথ ধরলাম। এখন থেকে রীতিমত পাহাড় আরম্ভ হলো ; শুধু পাহাড়ের মরুভূমি, উত্তপ্ত বহ্নিজ্বালায় পরিপূর্ণ ; শুধু আগ্নেয় নিঃশ্বাসে ভরা, তারই পার্শ্বে আবার গহন অরণ্য : দিগন্তব্যাপী ; ভীষণ হিংস্র জন্তুর লীলাভূমি, মাঝখান দিয়ে সংকীর্ণ পথ, পাহাড় কেটে পথ বের করা হয়েছে, শুধু একখানি গাড়ী যেতে পারে সে পরিমাণ মাত্র প্রশস্ত। এক পার্শ্বে প্রায় চার হাজার ফিট উঁচু পাহাড়, অপর পার্শ্বে তলহীন গিরিগহ্বর, বিরামহীন এই দৃশ্য ; পাহাড়ের পর পাহাড় ; অরণ্যের পর অরণ্য ; গহ্বরের পর গহ্বর, এক বিরাট বিশাল নির্জনতায় পরিপূর্ণ ; সারা বিশ্ব যেন এখানে এসে পড়ে রয়েছে—সর্ব প্রাণশক্তিহীন হয়ে।

ভয়ে বুক কাঁপে ; গাড়ী একটু অসাবধানে চললেই হলো, দু' মাইল নীচে গিরিগহ্বরে শ্বাপদসংকুল অরণ্যের মাঝে মৃত্যুবক্ষে স্থান অনিবার্য। গাড়ী ক্রমাগত উপরের দিকেই উঠছে, গাড়ী থেকে নেমে মেয়েদের গাড়ী পিছন থেকে ঠেলে ধরতে হয়, আবার গাড়ী নীচের দিকে নামবার

সময়ও পিছন থেকে টেনে ধরতে হয়, নচেৎ গাড়ী উল্টে গেলে মৃত্যু অনিবার্য। এর মধ্যেই একটি গুজরাটী পরিবার ছেলেপুলে সহ কোন গিরির সানুদেশের পাতালপুরীতে ঢুকে পড়েছে, তার কোন খোঁজ নেই। প্রতি মুহূর্তে মৃত্যু এখন আমাদের পিছন পিছন চল্‌ছে। ভয়ে গাড়ী থেকে নেমে হাঁটতে লাগলাম, মেয়েদের ও ছেলেপুলে শুধু গাড়ীতে রেখে, কারণ তাদের পক্ষে হেঁটে যাওয়াও অসম্ভব: প্রত্যেক গাড়ীর পিছনে আমরা একজন করে' পুরুষ পাহারা দিয়ে চলেছি, একটু অসাবধান হ'লেই গাড়ী মারা যাবার কথা। যেখানে রাস্তা ভাংগা বা অত্যন্ত খাড়া, সেখানে মেয়েদের ছেলেপুলে সহ নামিয়ে দিয়েছি। কিন্তু মেয়েরা আবার সব সময় ভয়ে নামতে চায়নি, রাস্তার দু' পাশে মৃতদেহ—পচা, গলা, মাংস বের হওয়া। দ্বিতীয় দিন রাত্রি বারোটার সময় জ্যোৎস্না অস্ত গেলো; সকলেই আমরা গাড়ীর উপরে, হঠাৎ একটা জায়গায় এসে দেখি—সম্মুখে পঞ্চাশ-ষাটখানা গাড়ী রাস্তা বন্ধ করে' দাঁড়িয়ে রয়েছে, পাশ কেটে কারো আগে যাবার সাধ্য নেই; কারণ রাস্তা সংকীর্ণ—দু'খানা গাড়ী পাশাপাশি চলতে পারে না। বাধ্য হয়ে সেখানে আমাদের গাড়ীও থামাতে হলো। প্রায় ঘণ্টাখানেক পর জানা গেলো, সকলের আগের গাড়ীর গরু ভয়ানক দুর্বল হয়ে জিব্ বের করে' রাস্তায় শুয়ে পড়েছে; আজ আর কোন গাড়ী চলবে না। এখানেই থাকতে হবে। গাড়োয়ানরা গাড়ী থেকে গরুগুলিকে ছাড়িয়ে নিয়ে পাহাড়ের গায়ে বাঁধলো, গাড়ী থেকে আমাদের নামিয়ে দিয়ে মালপত্র ও বিছানা যেমন খুশী ঠেলে সরিয়ে নীচে থেকে গরুর খড় টেনে বের করে' গরুগুলিকে খেতে দিলো। আমাদের দাঁড়াবার পর্যন্ত এতটুকু স্থান নেই। একদিকে উঁচু পাহাড়, অপর দিকে সেই পাহাড়ের তলহীন গহ্বর। একটু অসাবধান হ'লে রক্ষা নেই; ছেলেপুলে কোলে নিয়ে গাড়ী ধরে' মৃত্যুর হাতে প্রাণ-সমর্পণ করে' ভয়ব্যাকুল চিত্তে রাস্তার

উপর আমরা দাঁড়িয়ে রইলাম। কম্পাউণ্ডারবাবুর মেয়ে আভা আমার কোমর জড়িয়ে ধরে' দাঁড়িয়ে ভয়ে কাঁপছে। ছেলেপুলেগুলি জল জল করে' চীৎকার করছে। একটা জলের টিনে সামান্য একটু জল আছে; তাই সকলকে একটু একটু দিয়ে ঠাণ্ডা করলাম। শোনা গেলো—কাল বেলা বারোটার পূর্বে কোথাও জল পাওয়া যাবে না। ভেবে কোন ফল নেই, অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে। জলের অভাবেই শেষে দেখছি মরতে হবে।

আভা একটু জল খেয়ে অমনি আবার বমি করে' দিলো। হঠাৎ কোত্থেকে ভয়ানক পচা গন্ধ এলো, পকেটের টর্চটা জেলে আশে-পাশে ভালো করে' চেয়ে দেখি—কয়েকটা মৃতদেহ; পচে' গলে' পড়ছে। চুপ করে' গেলাম কাউকে কিছু না বলে; এমনিই ভয়ে অস্থির, তার উপর পাশের এ দৃশ্য দেখলে হয়তো ফিট হয়ে পড়বে।

গরুগুলির ঘাস খাওয়া শেষ হলো। এখন আর খড় টেনে বের করতে হবে না; তাড়াতাড়ি মেয়েদের ও ছেলেদের গাড়ীতে উঠে বসতে বললাম। আমরা পুরুষেরা গাড়ীতে উঠে বসতে চাইলে গাড়োয়ানরা দা' দেখিয়ে বারণ করে' বললো, কেটে ফেলবো গাড়ীতে উঠলে। আমাদের পরিবর্তে তারাই উঠে আমাদের বসবার বিছানা তুলে' তাদের শোবার ব্যবস্থা করলো এবং শুলো। সারা রাত মৃত-গলিত শবের গন্ধ সহ্য করে' দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাত্রি ভোর করলাম।

পরদিন আবার গাড়ী চললো: এবার একত্রে শ'খানেক গাড়ী। আমাদের সম্মুখের গাড়ীগুলি আগে আগে: মনে হলো আমরা যেন জগতের আদিম অধিবাসী; অসভ্য বর্বর গুহাবাসী, যেখানে যাই, দল বেঁধে যাই। যেখানে পাহাড়ে পর্বতে, অরণ্যে বাস করি; দল বেঁধে বাস করি। যেখানে পাহাড়ের পুরাতন তরুশ্রেণীর ছায়াশীতল স্থানে বিশ্রাম করি, দল বেঁধে বিশ্রাম করি। এ পাহাড়, এ অরণ্য, গিরিগহ্বর আমাদের

জন্মস্থান; এ অরণ্যের শ্বাপদকুল আমাদের ভক্ষ্য: আমরা হিংস্র জন্তুর মত মাংসাশী; তাই সুসভ্য জগত হ'তে বিচ্ছিন্ন হয়ে পাহাড়ে, অরণ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি শিকারের সন্ধানে। সমস্ত বাহির বিশ্ব আজ আমাদের কাছে লুপ্ত; সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান, সমস্ত রাজনীতি, অর্থনীতি, সমস্ত প্রকার প্রগতিশীল আচার, ব্যবহার, চালচলন—সবই যেন আজ আমাদের কাছে অর্থশূন্য; মৃত কংকালে পরিণত। শহরের স্কুল, কলেজ, কাছারি, আদালত, ধর্ম-মন্দির, পূজা-অর্চনা—সব এক মিথ্যার ছায়ায় ভরা। শুধু সত্যের তিক্ত জীবন-ছবি আমাদের নয়ন সম্মুখে। সেথানে দেখি—বহ্নিতপ্ত পথের ধূলি, বিশ্ববিহীন নির্জন পাহাড়ের গা ঘেঁষে অনির্দিষ্টের পানে ছুটে চলা। পথ সংকীর্ণ; পথশ্রান্ত ও উত্তপ্ত ক্ষুধিত তৃষিত দেহ, ধূলি-ধূসরিত জীর্ণ শীর্ণ প্রতি অংগ: পরিহিতে ছেঁড়া কাপড়, ছেঁড়া জুতা, এ রুক্ষ কেশ; পরিব্রাজকের অনাড়ম্বর বেশ, সন্ধানী আত্মার আকুল কান্না যাত্রাপথের প্রান্ত খোঁজে—এ সকলই যেন জীবনের পরিপূর্ণ মর্মভেদী সত্যের বাণী নিয়ে আমাদের সম্মুখে বিপুল বিরাট রূপে দাঁড়ালো।

আস্তে আস্তে গাড়ী উঠছে পাহাড়ের উপরে: ঠিক আগের মতো নেতা সেজে বসে আছি সম্মুখের গাড়ীতে, এবার রাস্তা নাক-বরাবর সোজা; সম্মুখের প্রায় শ'খানেক গাড়ী স্পষ্ট দেখা যায়, সারবন্দী হয়ে চলছে, একেবারে সকলের আগের গাড়ীখানা সকলের পশ্চাতের গাড়ী থেকে প্রায় একশ' ফুট উপরে; মনে হলো, আমরা সব ভীমের বড় ভাইয়ের দল, সশরীরে স্বর্গারোহণ করছি। কিন্তু স্বর্গের পথ শুনেছি সুধার সরোবরে ভরা; এ পথ তা নয়; এ পথ মরুময়, সাহারার তপ্ত রুদ্ধশ্বাসে পরিপূর্ণ; ধরার সামান্য একফোঁটা জলও এখানে নেই; পিপাসা বুকের তল মরুভূমি করে' মুখে চোখে উত্তপ্ত নিঃশ্বাস ছাড়ছে। সমস্ত প্রশান্ত মহাসাগরের জলও যদি এখন সম্মুখে পেতাম, তবুও যেন

আমাদের এ শ'খানেক গাড়ীর লোকের দেহের জ্বালা শান্ত হতো না। আমরা যেন ছুটে চলেছি পৃথিবীর নদ নদী, সাগর উপসাগর মহাসাগর খুঁজে বের করবার জন্যে, কিন্তু বৃথা চেষ্টা—সম্মুখে পশ্চাতে, ডাইনে, বাঁয়ে শুধু একটানা পাহাড় আমাদের মতোই ক্ষুধিত, তৃষিত পাষাণে পরিপূর্ণ। পাহাড়ের দেহ ভেদ করে' সে পাষাণের শুষ্ক জিহ্বা যেন রাস্তার উপর বের হয়ে পড়েছে। গিলতে চায় যেন আমাদের।

বেলা তখন বারোটা-একটা বাজে; হঠাৎ সম্মুখের গাড়ী থেমে গেলো; সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গাড়ীও। ব্যাপারটা প্রথম বুঝতে পারলাম না! তবে কি বন্য জন্তু সামনে পড়লো? কিছু দূরে সম্মুখের দিকে অসংখ্য লোকের কোলাহল শুনছি; লোক দেখি না, শুধু কোলাহলধ্বনি; সামনের পাহাড়টার ঐ পাশ থেকে আসছে। দেখলাম, সকল গাড়ীর গাড়োয়ানরাই গরু ছেড়ে পাহাড়ের গায় বেঁধে ঘাস দিচ্ছে। গাড়ী থেকে নেমে কত দূর এগিয়ে গিয়ে দেখি—প্রায় দু' হাজার লোক রাস্তার উপর বসে রান্নাবান্না করছে; এরা প্রায় সকলেই পায়ে হেঁটে এসেছে। তাদের কোলাহলে সমস্ত পর্বতভূমি মুখরিত। এত কোলাহলের কারণ কি? কারণ, এখানে নাকি জল পাওয়া যায়। আনন্দে নিজের বুকও ভরে' উঠলো নিঃশব্দে। তাড়াতাড়ি আমাদের লোকের কাছে এসে বললাম—সব গাড়ী থেকে নেমে এসো; রান্না করা হবে। এখানে জল পাওয়া যায়। সকলের মুখেই শুষ্ক ম্লান খুশীর হাসি। এসে একটা ভালো জায়গা খুঁজতে লাগলাম, রান্না করার জন্য; কিন্তু অসম্ভব। আশে পাশে মড়ার অন্ত নেই। সে কি দুর্গন্ধ! কিন্তু তাতেও কারো ঘৃণা বা অপ্রবৃত্তি নেই, মৃত পচা দেহের কাছে বসে খেতে। দুর্গন্ধ ও পচা শবদেহ দৃশ্য আমাদের সয়ে' গেছে; আমরা যেন গলিত স্খলিত পচা দেহের প্রবাহ-স্রোতেই ভেসে চলেছি; আমাদের কাছে মৃত্যু ও মৃত্যুময় দেহই সত্য; জীবন, সমাজ, সংসার—সব মিথ্যা।

মেয়েরা সব রান্না করতে বসে গেলো; কিন্তু জল কোথায়? এখানেও কোন সাগর সরোবর দেখি না; তবে লোকের এত আনন্দধ্বনি কেন? শেষে শোনা গেলো, জল আছে—এ পথ ধরে' অনেকখানি নীচে নামলে জল মিলবে। দু' একজন ছাড়া আমরা সবাই এগারোটা জলের টিন নিয়ে জল আনতে গেলাম। গহন অরণ্য; মাঝখান দিয়ে একজন লোক চলবার মত রাস্তা; প্রায় এক মাইল নীচে নেমে শেষে জল পেলাম। ঝর্ণা নয়, স্বচ্ছ নীল সরোবর নয়; অতি ছোট একটি গর্ত; তার মধ্যে সামান্য টলটলে জল; টিনের গ্লাসে আর চায়ের কাপে করে' আস্তে আস্তে জল তুলে টিনে ভরলাম। কিন্তু আশ্চর্য্য এই, যত তোলা যায়, গর্তের জল নিঃশেষ হয়ে যায় না; যেমন আছে তেমনি থাকে। এ রকম জলের গর্ত প্রায় সাত-আটটা, সবাই জল তুলে নিচ্ছে। কিন্তু এ জল যে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ তাও বলা যায় না। কারণ এ জলের কিনারাতেই দেখলাম কতগুলি মৃতদেহ। জল খেয়ে ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়েছে চিরজীবনের তরে।

এভাবে সমস্ত পাহাড়ী পথ পার হয়ে এলাম সাত দিনে। সাতটা জলন্ত শ্মশানবহ্নি যেন আমাদের সকলকে অর্ধ দগ্ধ করে ছেড়ে দিয়েছে। মরে গেছি আধা: সন্দেহপূর্ণ আধা-জীবিত দেহ নিয়ে এসে পৌছালাম টাংগুব। এখান থেকে ছোট জাহাজে আকিয়াব যেতে হবে। কিন্তু টাংগুবের দৃশ্য আরও মর্মভেদী। প্রকাণ্ড মাঠ; প্রায় সত্তর পঁচাত্তর হাজার ভারতীয় এখানে খোলা মাঠে এসে জমা হয়েছে। দিনের বেলা প্রচণ্ড রৌদ্রের তাপ, রাত্রে ভয়ানক শীত। এ হেন মাঠের মধ্যে হাজার হাজার লোক এখানে সেখানে পড়ে'। শহরে যাবার হুকুম নেই, কারণ আমাদের গায়ে মৃত্যু-গন্ধ; ছোঁয়া লাগলে শহরের কর্পোরেশন-দেহ রুগ্ন হ'তে পারে। পড়ে' আছি মাঠে, বিশ্বের অনাদৃত হয়ে; ঘৃণা, অবহেলা, তুচ্ছতাচ্ছল্যে আমাদের জীবন নুয়ে পড়া। এতটা রাস্তা এসে হয়তো এখানেই শেষে মারা যাবো। দিনে অন্তত দশবার করে' খবর

নিতে যাই, ষ্টীমার এখান থেকে কবে ছাড়বে। এ মাঠের কিছু দূরেই ষ্টীমার ষ্টেশন, একটা খালের মতো ছোট্ট লবণাক্ত জলার ধারে। ষ্টীমার আজ তিন দিন যাবৎ নেই; এদিকে আমাদের সংগে এবং আর সকলের সংগে যে চাল ডাল ছিলো, তা শেষ হয়ে গেছে। শহরে ঢুকতে দেয় না; চাল ডাল কিনবো এমন সাধ্য নেই; পৌণে দু' সের চাল আড়াই টাকা দাম; মুশুরী ডালের সেরও আড়াই টাকা, একটা দিয়াশলাইর বাক্স চার আনা; বাধ্য হয়ে এ সুলভ মূল্যেই জিনিষপত্র কিনে জীবন বাঁচিয়ে রাখলাম। এখানে আবার সেই পাহাড়ের মতোই জল নেই। মনে করেছিলাম, ষ্টীমার ষ্টেশন, নদী যখন আছে, জলের চিন্তা দূর হবে; কিন্তু জলের তো ঐ অবস্থা, মুখে দেওয়া যায় না—এতো বিষাক্ত। গেলাম বস্তিতে জল আনতে, এক টিন জল এক টাকা। রোজ আমাদের দশ টাকার জল লাগতো।

এখানেও জলের ও খাদ্যের অভাবে শত শত লোক মরতে লাগলো। এখান থেকে তাড়াতাড়ি জাহাজ পেলে লোকগুলি হয়তো পার হয়ে গিয়ে বাঁচতে পারতো, কিন্তু দৈনিক হাজার হাজার লোক এসে জমা হচ্ছে; চেহারা সকলেরই আমাদের মতো কংকালসার। মাত্র হাড় ক'খানা কোন রকমে ঠেলে আনা হয়েছে, মানুষের চেহারা কারো নেই! জীবনের উত্তপ্ত অভিশাপ সকলের চোখে মুখে।

এখানে আমরা প্রায় কুড়িটি বাংগালী পরিবার একত্র হয়েছি, সকলেই একটা পাহাড়ী ঝোপের ধারে ক্ষেতের উপর বিছানা পেতে তিন-চার দিন যাবৎ বসবাস করছি। দিনের বেলা ঝোপের ভিতরে বসে' থেকে রৌদ্রতপ্ত দেহ বাঁচাই আর রাত্রি বেলা কাপড়ের তাঁবু তৈরী করে' তার নীচে শীতে বরফ হয়ে ঘুমোই। মিষ্টার সুরেশ বোস, হেড্ মাষ্টার লাহিড়ীবাবু, অজিত ঘোষ, ডাক্তার দত্ত ইত্যাদি আমরা সকলে মিলে পরামর্শ করলাম—কেউ কাউকে ফেলে যেতে পারবো না, যেতে

হয় সকলে একত্র এক সংগে টিকেট করে' যাবো, না হয় এখানে সকলে এক সংগে মরবো। সংকল্প উদার, অন্তত বাংগালীর পক্ষে।

পরদিন তিনখানা জাহাজ এক সংগে এলো। লোক পাগলের মত ছুটোছুটি করতে লাগলো টিকেটের জন্য ঃ কিন্তু কার সাধ্য টিকেট ঘরের কাছে যায় ; টিকেট ঘর থেকে প্রায় আধ মাইল পর্যন্ত লোকের ভিড় ; তার উপর পুলিশের তাড়না। বিনয়-নম্র বচনে এখানে টিকেট মিলে না ; গায়ের বলেও নয়, শিক্ষার ছাপেও নয়, একমাত্র উপায় টাকা। আমরা একশো টাকা ঘুষ দিলাম একশো টিকেটের জন্য, মিললো টিকেট অনায়াসে। পরে আমাদের মধ্যে টিকেট ভাগাভাগির পর জাহাজে উঠবার বন্দোবস্ত হলো। মালপত্র যা-কিছু সব নদীর তীরে এনে একত্র করে' রাখা হয়েছে, জাহাজ একটু দূরে নোঙর ফেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে, এখনও তীরে লাগে নি, আমরা সব প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছি ; কিন্তু যখন জাহাজ তীরে এসে ভিড়লো তখনকার অবস্থা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না, প্রায় হাজার তিনেক লোক এসে ঝুঁকে পড়লো ; এদের মধ্যে টিকেট অনেকেই করে নি বা করতে পারে নি। মেয়ে-ছেলে নিয়ে ভীষণ চাপে পড়ে' গেলাম ; রামকিষণ, বসির, নিতাই ও সুরেশ আমার আগে ভীড় ঠেলছে। আমার পিছনে—গৌরী আমার ডান হাত ধরে', পরে ডাক্তার পালের স্ত্রী, শকুন্তলা দেবী, গৌরীর মা। সকলের পিছনে কম্পাউণ্ডারবাবু ও সুধাংশুবাবু। প্রত্যেকের কোলে ছেলেপুলে। কুলীরা সমস্ত মালপত্র নিয়ে অনেক পিছনে রয়েছে, এদিকে পুলিশ লাঠির চোটে ভীড় তাড়াচ্ছে। পকেটে দশ টাকার নোট গুঁজে দিতেই পথ ছেড়ে দিলো। জাহাজে উঠতেই জাহাজ ছাড়বার বাঁশী বাজলো। নইলে জাহাজ লোকের ভিড়ে ডুবে যায়, ছোট্ট জাহাজ ; আরোহী দ্বিগুণ। চেয়ে দেখি আমার দারোয়ান মণীন্দ্র, ভৃত্য শৈব আর মালপত্র সহ কুলী—কেউ উঠতে পারেনি। মেয়েরা কান্নাকাটি

করলো তাদের সর্বস্ব টাংগুবে পড়ে রইলো। আমি মনে মনে কেঁদে আকুল হ'লাম দু'জন মানুষের জন্য। ওদের হাতে টাকা পয়সা নেই, না খেয়ে মরবে নিশ্চয়; পড়ে' থাকবে ওদের মৃতদেহ বিজ্ঞান ও সমরের দুঃখবাদ-ব্যথা বক্ষে বহন করে'।

আকিয়াব তখনও শত্রুর বোমা হ'তে অনেক দূরে। দু'দিনে এসে পৌছালাম এখানে। এখানকার বাংগালীরা যথেষ্ট সাহায্য করলো; প্রকাণ্ড একটা ঘর আমাদের জন্য ঠিক করে' দিয়ে স্নান আহারের ব্যবস্থা করে' দিলো। তেইশ দিনে এসে আকিয়াব পৌছেচি। স্নান, আহার কাকে বলে ভুলে গিয়েছি। স্নান আহারের কথা শুনে মনে প্রশ্ন জাগলো —আমরা এ কোন্ রাজ্যে এলাম। স্নান, আহার, সমাজ, সংসার, সভ্যতা, ভদ্রতা? এ সকলের প্রয়োজন আছে কি?

পরদিন "বরদা" জাহাজে চট্টগ্রাম রওনা হ'লাম। বঙ্গোপসাগরের এক কোণ ঘেঁষে ভয়ে ভয়ে জাহাজ চলছে। অনন্ত জলরাশি: অনন্ত আনন্দ ও জীবনোচ্ছ্বাস আমাদের বুকে। গিরিমরুপথে যে জলের জন্য প্রাণসাগর সমুদ্র খুঁজে বেড়াচ্ছিলো, এখন তারি বক্ষে। অথচ এখন একফোঁটা জলের পিপাসা নেই। বিচিত্র এ মানবজীবন; বিচিত্র তার বক্ষের ক্ষুধা তৃষ্ণা।

চট্টগ্রাম এসে পৌছালাম। ইভাকুইজদের জন্য রেলগাড়ীর ভাড়া নেই। কিন্তু আমাদের টিকেট করতেই হলো, আমরা ইভাকুইজ্ হ'তে চাই না; এখন আমরা সভ্য। অরণ্য ও মরুবাসীর পোষাক পরিচ্ছদ আমাদের আর নেই। ভুলে গেছি আমাদের আদিম ইতিহাস।

চট্টগ্রাম থেকে সকলকে টিকেট করে' দিয়ে দেশে পাঠিয়ে দিলাম। সকলেই আন্তরিক আশীর্বাদ জানালো। কিছুই জানাতে পারলো না শুধু গৌরী: সে শুধু চোখ দু'টী মুছতে মুছতে মাথা নত করে' রইলো। আমার বুকে নেমে এলো একটা মৌন দীর্ঘশ্বাস!

বেসুর

সারাদিন এ চীৎকার আর ভালো লাগে না; বিরক্ত হয়ে গেছে মন। এক পাল মেয়ে নিয়ে গরু তাড়ানো কাজ ক'দিন ভালো লাগে? মানুষ তো? মেসিন নয় যে দিনরাত একটানা অক্লান্ত চললেও এ দেহের কোন অংশ হানি হবে না। ইংরেজীর পর বাংলা; বাংলার পর ভূগোল; ভূগোলের পর আবার ইতিহাস। সেই বেলা দশটা থেকে আরম্ভ ক'রে চারটা পর্যন্ত অনবরত মুখ নাড়তে নাড়তে মুখ ব্যথা হয়ে যায়। আর মেয়েগুলি যদি লেখাপড়ায় একটু ভালো হতো তবে কি এতো খাটতে হতো? আমার ক্লাশের মেয়েগুলি যেন একেবারে সর্বশ্রেষ্ঠ মস্তিষ্কহীন। এককথা পঞ্চাশ বার বুঝালেও মাথায় ঢোকেনা; হাঁ করে আমার দিকে চেয়ে থাকে; মাথায় কি কিছু আছে? তবুও শিক্ষিতা হবেই; তবু ম্যাট্রিক পাশ করবেই। ম্যাট্রিক পাশের মূল্য কি শুনি? বি-এ পাশ করে' তিরিশ টাকা মাইনেয় মাষ্টারী করি দিনরাত মুখ চালিয়ে। তা আবার দু'একদিন স্কুলে না এলে হেড মিস্ট্রেসের সংগে কথা কওয়া যায় না; পাঁচ কথা জিজ্ঞেস করলে মুখভার করে' এক কথার জবাব দেয়। ভারী তো চাকুরী। নীলিমা শেষে ক্ষুণ্ণ ও তিক্ত মনে ক্লাসের মেয়েদের দিকে একবার বিরক্তির চোখে চেয়ে বলে, এ ঘণ্টায় ইতিহাস; আচ্ছা খুব সুন্দর করে' আকবরের চরিত্র খাতায় লিখে দাও। আধ ঘণ্টার মধ্যে লিখতে হবে।

মেয়েরা লিখতে থাকে। নীলিমা ক্লাসের দক্ষিণ দিকের জানালার দিয়ে চেয়ে থাকে; উদাস-কাতর করুণ চাহনি। তার বুকের তলে জমে' উঠে বর্ষার নিবিড়তা। দু'টি চোখ সিক্ত হয়ে উঠে গোপনে; মনে পড়ে তাঁর তপ্ত জীবনের স্মৃতি। সে-সব কথা আজ ভাবতেও তার শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে। অন্তরের নিভৃত কোণে জাগে কাতর স্পন্দন। সবে মাত্র সেবার সে ম্যাট্রিক পাশ করে' কলেজে প্রথম বর্ষে

ভর্তি হয়েছে। বাবা ওকালতি করেন, সামান্য আয়। মেয়ের বিয়ের জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। এম. এ. পাশ সুদর্শন ও সুন্দর স্বাস্থ্যসম্পন্ন একটি ছেলের সংগে তার বিয়ে ঠিক করলেন; সরকারী অফিসে চাকুরী করে; একশ' টাকা মাইনে। আজকালকার দিনে বেশ ভালো পাত্র। কিন্তু সে কিছুতেই বিয়ে করতে রাজী হ'লো না। আধুনিক মতে সে মত দিলে। প্রগতির যুগে বিয়ে করে কোন মেয়ে? এ সোনার যুগে লোহার শিকল গলায় পরে' কারাগার-বন্দী-ব্যথা কোন গেঁয়ো মেয়ে ডেকে আনে। এ যুগ অপরিসীম যুগ; বিস্তীর্ণ পথঘাট; ক্লান্তিহীন ট্রাম বাস; অবাধ স্কুল কলেজ; জীবন্ত জ্ঞান বিজ্ঞান; প্রাণস্পর্শী সাহিত্য, শিল্প; প্রেমপুঞ্জ সিনেমা, বায়স্কোপ; উদার মাঠ; লেকের স্বচ্ছ নীল জল; যৌবন-পরিমল অফুরন্ত। এত নীল, এত সবুজ, এত রঙের উর্মিনাচানো জীবনের ধারায় গা ঢেলে না দিয়ে কোন রুগ্ন রুচিসম্পন্ন মেয়ে বিয়ে করে' এ জীবনটাকে একেবারে মাটি করে' দিতে চায়? সে বি. এ. পাশ করে' স্বাধীন মনের স্বাধীন চিন্তা নিয়ে অবিবাহিতা থেকে জীবনটাকে গড়ে' তুলবে নিজের ইচ্ছা মতো; সর্ব বাধা-বন্ধহীন; তবেই তো এ জীবন ধরায় ধন্য। বিয়ে করে' এ আধুনিক দিনে অল্প বয়সে বুড়ো হ'তে চায় কে? এমন অশিক্ষিত কল্পনা মনে আনতেও তার গা জ্বালা করে।

কিছুতেই সে বিয়ে করলে না। কল্লোলময় নবীন জীবনের ঢেউ খেলানো কল্পনার আনন্দই তার চোখে স্বপ্ন রচে' দিলো অসীম সুরভিময়। ব্যর্থ হ'লো পিতার অনুরোধ প্রগতিশীলা শিক্ষিতা মেয়ের সুখ-বাদের কাছে।

নীলিমা লেখাপড়ায় ভালো। অনায়াসে সে শেষে বি. এ. পাশ করে' বের হ'লো। আধুনিকা মা হ'লেন সুখী; পৌরাণিক বিচক্ষণ পিতা হ'লেন মনে মনে দুঃখিত, চিন্তিত। বি. এ. তো পাশ করলে, কিন্তু বয়সও তো সাথে সাথে পার করলে; চব্বিশ বছর এখন মেয়ের বয়স; ও-বয়সে

অবিবাহিতা মেয়ের স্বাস্থ্য থাকে? না ভাংগে। ভালো বর কি আর মিলে! তবু আর একবার চেষ্টা করে' দেখা যাক। এখন বি. এ. পাশ করেছে, বুদ্ধি হয়েছে একটু। কিন্তু নীলিমা শুধু পাশ করেছে, বুদ্ধি তার মোটেই বাড়ে নি। শেষে সকল চেষ্টাই বিফল হ'লো। নীলিমা কিছুতেই বিয়ে করবে না; সে এখন শিক্ষয়িত্রীর কাজ করবে; সর্বদা পড়াশুনা নিয়ে থাকবে; উচ্চ চিন্তায়, আদর্শ ভাবনায় তার জীবন হয়ে উঠবে ধন্য।

শেষে নীলিমা পল্লী অঞ্চলে একটা বালিকা বিদ্যালযে চাকুরী নিলে। দিনরাত এক পড়ানোর কাজ; আজ পাঁচ বছর পড়াচ্ছে; শুধু এক অষ্টম ক্লাসেই; কচিৎ নবম, দশম ক্লাসে; যেদিন সে-সব ক্লাসের মাষ্টার আসে না, নইলে তার পড়ানোর কাজ এই এক ক্লাসেই বন্দী। একেবারে অসহ্য হয়ে উঠেছে। এই কি তার স্বাধীন জীবন? স্বাধীন চিন্তা? বাধা-বিহীন জীবনের গতি? এই কি তার দু'টী স্বাধীন চোখের স্বাধীন স্বপ্ন ঐশ্বর্য?

একতলা টিনের ঘরে স্কুলের বোর্ডিং, মাটির মেঝ, তার উপর চৌকি পাতা, গরীব স্কুল, গরীব ঘর। চারিদিকে জংগল, কচুবন; আগাছার ঝোপ; বরষার দিনে ভেকের মুখরতা; বোর্ডিং-এর নির্জনতায় জেগে উঠে যেন বিষাদকান্নার সুর। বিপুল বিশ্বের এক কোণে অবস্থিত ও নির্জীব ঘরটির দিকে চেয়ে সে কেঁদে উঠে।

নীলিমা থাকে ঐ অন্ধকার কোণের সীট্‌টায়। তার পাশে আবার বেতসের বন। দিনের বেলায়ও ঘোর অন্ধকার; মশা ও মাছির পাহাড় যেন সর্বদা ভিড় করে তার ঘরখানায়। চৌকি থেকে নামলেই মাটিতে পা ফেলতে হয়; ঘরটা এত ঠাণ্ডা যে, দিনরাত তার সর্দি-কাশি লেগেই আছে। সেই সুন্দর শরীরটা, সেই সুন্দর গোলাপী মুখখানার দিকে আজ আর চাওয়া যায় না। ছোট একখানা সস্তা মূল্যের আয়না, অনাদরে পড়ে' থাকে টেবিলের একধারে। এই উনত্রিশ বছরের মুখ বার বার দেখে লাভ নেই। মনে পড়ে সেই কলেজ-জীবনে ড্রেসিং

টেবিলের সম্মুখে দাঁড়িয়ে মুখ দেখার কথা; কি সুন্দর স্নিগ্ধ শুভ্র আভায় ভরা ছিল চোখ দু'টি; বিয়ে করবে না সে; দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। কিন্তু তাতে কি? •সে জন্য তো আর মনের কল্পনা-উৎস মরে' যায়নি? যদি এ মধুযামিনীকূলে দাঁড়ানো রূপালী বয়সটাকে ক্ষণিক সুখী করা যায় ক্ষতি কি? শত ত্যাগী পুরুষও ত্যাগের সংগে ভোগের কল্পনা করে; কল্পনা-বিলাসী মন; তাকে বেঁধে রাখা যায় না। কিন্তু আজ সে কল্পনার মনও নাই; সেই রামধনু-আঁকা স্বপ্নমাখা চোখের সামনে রাজপুত্রের পক্ষীরাজ ঘোড়াও নাই। আয়নার প্রয়োজন কি? মুখ চোখ দেখে আর কি হবে? এখন একঘেয়ে স্বাধীন জীবন; একঘেয়ে পড়ানোর কাজ; বৈচিত্রহীন বোর্ডিং-এর ঘর। বৈচিত্রহীন জীবনের তপ্ত প্রবাহে ভেসে যাচ্ছে সকল দেহ। আজ জীবনের এ রূপহীন স্বাধীনতা বহ্নি হয়ে দেখা দিচ্ছে চারিদিক থেকে। এখান থেকে পালাবার পথ আছে? কোথায়? অসম্ভব। তাকে তো স্কুলের শিক্ষয়িত্রীর কাজ করতেই হবে; এ-ছাড়া এ-বয়সে তার জীবনের উদ্দেশ্য আর কি থাকতে পারে? মেয়েরা স্বাধীন হয়ে কে কোথায় কি মহৎ-কাজ করেছে? হয় মাষ্টারী, না হয় ধাত্রীগিরি।

মেয়েরা শেষে আকবরের চরিত্র খাতায় লিখে নীলিমাকে দেখালে; পড়ে' বললে—মন্দ হয়নি। চারটা বাজে; স্কুল ছুটী হয়ে যায়। নীলিমা তার বোর্ডিং-এর ঘরে ফিরে আসে। সেই একলা ঘরে, আপন নিরালা মনের সাথী হয়ে। অসহ্য নিঃসংগ জীবন। এমন সময় মণ্টু এসে ডাকে—মাসিমা, মা তোমাকে ডেকেছে; চলো আমাদের ঘরে। বোর্ডিং-এর ও'পাশে রাণুদি'র বাসা; মণ্টু রাণুদি'র ছেলে। মিষ্টি মধুর মণ্টুর কচি মুখখানা; ছোট্ট ছেলে। নীলিমা আদর করে' কোলে তুলে নেয়। মণ্টুর মুখে চুম্বন ঢেলে দিয়ে বলে, আমি বুঝি তোর মাসীমা? তা'হলে তোর মেশোম'শায় কোথায়?

মণ্টু নীলিমার মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

নীলিমা বলে, বোকা ছেলে; তোর মেশোমশায়কে চিনিস না? সেই সে বছর আমার সংগে যার বিয়ে হবার কথা ছিলো; এম. এ. পাশ, দেখতে সুন্দর; ক'লকাতায় সরকারী অফিসে চাকুরী করতো; একশ' টাকা মাইনে। এতদিনে হয়তো দু'শো টাকা মাইনে হ'ত। তোর মাসীমা আজ কত বড়লোকের বউ হয়ে, কত সুখে থাকতে পারতো। তাকে কি আজ এ তিরিশ টাকা মাইনে চাকুরী করে' বোর্ডিং-এর এ ভিজে স্যাঁতসেতে ঘরে থেকে সর্দি, কাশি ও ম্যালেরিয়ায় ভুগতে হ'ত? এমন রোগা, এমন কংকালসার, এমন দীন চেহারা, এমন নুয়ে-পড়া দেহ, এমন অকাল-বৃদ্ধ, এমন অবাঞ্ছিত? এমন স্থানে সর্ব আয়োজনহীন স্বাধীনতা নিয়ে? আজ আমার এমন রুগ্ন স্বাধীনতার কোন মূল্য আছে? সেই স্বাধীনতাই সুন্দর, সুশ্রী স্বামী আদর করে' যেটুকু দেয়।

মণ্টু হাঁ করে নীলিমার মুখের দিকে চেয়ে থাকে; শেষে কোল থেকে নেমে যেতে চায়। নীলিমার সর্বদেহে মাতৃহৃদয় কেঁদে উঠে; দু'টী বাহু দিয়ে মণ্টুকে জোর করে' জড়িয়ে ধরে। তার অন্তরে কেঁপে উঠে মায়ের প্রাণ।

অশ্রুসিক্ত চোখে নীলিমা শেষে বলে—মণ্টু, আমি তোর মাসীমা নই; আমি তোর ছোট মা। কেমন? মণ্টু মাথা নেড়ে সাড়া দেয়। নীলিমা অমনি মণ্টুর চোখে-মুখে-গালে তপ্ত চুম্বন-বরষা ঢেলে দেয়। শেষে কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে বলে—যাও লক্ষ্মী ছেলে, ঘরে ফিরে যাও; মাকে বলো গিয়ে মাসীমার শরীর ভালো না; আজ আর আসবে না।

মণ্টু চলে যায়।

অন্ধের প্রেম

আমি অন্ধ। আমি জন্মান্ধ। আমার কোন ভাষা নাই; অন্ধের আবার ভাষা কি? আমার ভাষা চির আঁধারে বন্দী। আমি তোমাদের ভাষায় আমার জীবনের অন্ধ-ছন্দের ঝংকার তুলবো; আমি তোমাদের ভাষায় আমার কথা বলবো।

আমি বিশ্ব-সৃষ্টির মাঝে এক বিরাট বেদনা। বজ্র ছিটকে পড়ে নভঃ হ'তে আমার দুঃখের দুন্দুভি বাজিয়ে; অসীম "না" দিয়ে ঘেরা আমার সমস্ত জীবন-প্রবাহ। শুধু এক সর্বশূন্য মহানিশি আমার চারিদিকে ব্যাপ্ত; আমার কাছে সমস্ত বিশ্বটা একটা মহারাত্রি। এখানে চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারা নাই; নাই জ্যোতিষ্ক-সমাজ; নাই আলোর সোনালি উৎসব। আছে শুধু শ্রাবণ-তিমির-শর্বরী-ঘেরা মহা অন্ধকার—আমি যেন তমসাচ্ছন্ন গভীর রজনীর বুকে, গহন অরণ্যাভ্যন্তরে, অন্ধকার গিরি-গুহার অতল তলে একটি কালো অন্ধ বিন্দু—চির আঁধারে বন্দী, চির অন্ধকার পাতালপুরবাসী আমি।

এ ধরার আলোর খবর আমি কি জানি! পৃথিবীতে চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারা আছে না আছে, সে খবর আমার কাছে মিথ্যা; নিতান্ত দুঃসাহসিক কল্পনা। কখন পৃথিবীতে সন্ধ্যার কালো ছায়া ঘনিয়ে আসে; কখন রাত্রি এসে পৃথিবীর বুক অসীম কালোয় ঢেকে দেয়; কখন কর্মকোলাহলময় পৃথিবী এক অন্তহীন নীরবতায় থেমে যায়; কখন মৃত্যুময় সুপ্তি এসে ধরণীর দু'টী চোখে শিথিল পরশ ঢালে; কখন সমস্ত পশু, পক্ষী, জীব, জন্তু, তৃণ, তরু, লতা অবলুপ্তচেতন হয়ে পড়ে' থাকে মৃত্যুরাজ্যে; কখন আবার উষার অরুণ আলোক সোনার জাগ্রত পরশ ঢেলে' জীবন্ত করে' তোলে পৃথিবীর সমস্ত সুপ্ত নিশ্বাস। কখন রবি উঠে, চাঁদ ভাসে, নক্ষত্র হাসে; ধ্রুবতারা উষার আগমনী গায়—এ সকলই

আমার কাছে এক মহাসমস্যাময় প্রশ্ন। উত্তর খুঁজে পাইনে; শুধু চেয়ে থাকি অন্ধ নয়নে আঁধারের পানে গভীর বেদনায়। শুধু এ প্রশ্নময় চোখ দু'টী কেঁদে আকুল হয়; শুধু ভেসে চলি অন্তহীন আঁধার প্রবাহে। কি দরকার আমার উষার খবর শুনে? রবি-শশিপ্রদীপ্ত পৃথিবীর উজ্জ্বল আয়োজনে আর বসন্তের পুষ্পগন্ধে তোমাদের বিশ্ব জেগে উঠে সুরভিত হয়ে; মধুপ্রবাহ ছোটে বন হ'তে বনান্তরে; মধুলোভী মধুপের বক্ষে জাগে চুম্বনপিপাসা; ফুলের বুকে ঢালে সে তপ্ত অধরপরশ; রোমাঞ্চিত হয় নাকি শতেক লাজুক ফুলবক্ষ। গ্রীষ্মে ফোটে আম্রমুকুল; মানবের বুকে জাগে অমৃত রসপিপাসা। বকুল বনে পিক-বধূ প্রিয়ার বিরহে ঢালে আকুল কুহুধ্বনি আর ব্যাকুল ক্রন্দন-গীতি। বহুদূর থেকে কাণে এসে পশে সেই করুণ কান্নাগীতি। শুনে কাঁদে আমার বুক; দেখতে ইচ্ছা করে সেই অভাগা পাখিটাকে: কিন্তু দেখতে পাই না; চোখের সামনে চির অন্ধকার কালো যামিনী যে! শুনেছি পাখিটা কালো; মনে মনে ভাবি, তবে সে আমার পরম বন্ধু। ওর কালো রং আমার জীবনের কালো রংয়ের সাথে তাহ'লে বেশ মিল খেয়েছে। ওর বেদনাভরা বুক আমার বুকে টেনে নিতে ইচ্ছা হয়; ও যে হায়, আমার ব্যথার ব্যথী!

তোমাদের জগতে বর্ষণ আসে; আকাশ ঘনঘটায় ভরে' উঠে; নিবিড় কালো ছায়া নাকি ছড়িয়ে পড়ে ধরণীর বুকে; ঘরে ঘরে জাগে বিষাদ-করুণ, বিরহ-বিপুল সুর। আসে শরৎ, ভেসে উঠে আকাশ নীল নব কান্তি-রেখায়; গগনে গগনে আলোর মেলা; তরুলতায় জীবনের শ্বাস আর মাঠে মাঠে সোনালি ধান এনে দেয় কৃষকের চির দরিদ্র বুকে আশার আলো।

এই যে বর্ষব্যাপী ধরণীর রূপ-পরিবর্তন, কাল-পরিবর্তন, এ সব খবর আমি কি জানি! দু'টো কান দিয়ে তোমাদের মুখে সব কথা শুনি,

বুঝি এবং অনুভব করি। আমার চোখের দ্বার বন্ধ; সকল দৃশ্যমান জগৎ আমার কাছে মিথ্যা, অবলুপ্ত। একমাত্র স্পর্শমান ও শ্রুয়মান জগৎ আমার কাছে কথঞ্চিৎ সত্য বলে মনে হয়। শক্ত ও কোমল দ্রব্যকে স্পর্শে অনুভব করে' বলতে পারি, এ শক্ত আর এ কোমল। শব্দায়মান পৃথিবীতে কান দিয়ে শুনে অনুভব করে' বুঝি। কিন্তু সেই বুঝবার ও অনুভব করার মাঝে আবার কি যেন একটা অভাব থেকে যায়; কি যেন একটা বেদনা থেকে থেকে জেগে উঠে। মনে হয় স্পর্শ করে' যা' বুঝলাম, শব্দ শুনে যা' অনুমান করলাম, বোধ হয় তা' সত্য নয়। এবং সত্যই তা' সম্পূর্ণ সত্য নয়। চক্ষুষ্মানের অনুভূতির কাছে আমার এ অনুভব অনেকখানি শ্রীহীন। আমি বুঝতে পারি, কি যেন একটা হারানো ব্যথা বস্তুময় জগতে ঘুরে বেড়ায়।

শব্দজগৎ কিন্তু অন্যরূপ। সে সম্পূর্ণ সত্যরূপে আমার কানে এসে প্রবেশ করে। সেখানে যে সত্যের পরশ পাই, বোধ হয় অন্য কেহ তা' পায় না। সংগীত আনন্দ-নির্ঝর ঢালে আমার কানে; চিত্ত মাতাল হয়ে উঠে মধুর উন্মাদনায়। যেখানে দেখবার প্রয়োজন নাই, শুধু শুনবার প্রয়োজন, সেখানেই আমি পূর্ণতাপ্রাপ্ত। কোকিলের কণ্ঠস্বর যদি ময়ূরের কণ্ঠে উদ্গীত হয়, আমার তাতে কিছু এসে যায় না; যেহেতু, আমার কাছে শব্দ-মুখর-কণ্ঠকর্তা মিথ্যা; কণ্ঠকর্তা কালো পাখীই হোক বা বর্ণসমৃদ্ধ পাখীই হোক, সবার কণ্ঠরাগিণী আমার কাছে চিরমধুর চিত্তস্পর্শী; আমার চিত্তে প্রবেশ করে শুধু গানের প্রাণ আর সংগীতের অমৃতবার্তা। আমার এ অন্ধ-জীবনে শব্দ-ছন্দই একমাত্র সত্যধ্বনি নিয়ে প্রকাশ পায়।

এমনি করে' জীবনের পনেরটি বৎসর কেটে গেছে। এখন নাকি তোমাদের ভাষায়, পুষ্পিত ষোড়শী-রূপ আমার অংগে অংগে অবতরণ করছে। আমি নাকি এক অপূর্ব সুন্দরী হয়ে ফুটে উঠেছি এ অন্ধ

ধরার বুকে ; অনেক রাজরাজার ছেলে নাকি আমায় দেখতে আসে ; কিন্তু ফিরে যায় ব্যর্থ দু'টী আঁখির দিকে অশ্রুসিক্ত নয়ন ফেলে। আমি কিরূপ সুন্দরী, তা' আমি জানি না ; তবে অনুভব করি প্রতি অংগে, প্রাণে-মনে কিসের যেন অপূর্ব শিহরণ-চাঞ্চল্য ! একটা অব্যক্ত আকর্ষণ অবিরাম আমায় উতলা করে' তোলে। কেন বুঝি না, অহেতুক আমার প্রতি অংগ কেঁদে আকুল হয়।

আমার সেই বাল্যের, কৈশোরের শব্দায়মান ও স্পর্শমান জগতের সুন্দর, কোমল, নম্র, শান্ত অনুভূতি বা অভিজ্ঞতার মাঝে নেমে এলো তপ্ত রূপ, তপ্তরস, উষ্ণ সৌন্দর্যবোধ আর বহ্নি-স্পর্শ। আমি এখন পূর্ণ ষোড়শী। অংগে অংগে কিসের যেন সুগন্ধ। তোমাদের ভাষায় হয় তো বলা যায়, বসন্তের অনুরাগ আমার সকল দেহে ফুল-সুরভি ঢালছে। সে মাধুরী যে কিসের, কার জন্য, কেন, প্রথম কিছুই বুঝতে পারলাম না। মন যেন দিবারাত্রি কি খুঁজে বেড়ায় ; সমস্ত বহির্বিশ্ব জুড়ে কে যেন আড়াল থেকে আমাকে ডাকে ; যে কোন শব্দ শুনে' চমকে' উঠি ; যে কোন সুখস্পর্শ চিত্তে জাগায় অধীর কম্পন-দোলা। সেই বাল্যের, কৈশোরের শান্ত স্নিগ্ধ, নম্র-কোমল দোলা নয়, এ যেন বিদ্যুৎ-বহ্নিমাখা ! আমার শব্দায়মান ও স্পর্শমান জগতে যেন প্রায়ই বিরহ-নৃত্য চলছে। বনে পাখী ডাকে ; মনে অকারণেই নেমে আসে কিসের জাগরণ ; শিহরিয়া উঠে প্রাণ, চকিত হয় চিত্ত। কে যেন পাখীর মাঝে লুকিয়ে থেকে আমাকে চঞ্চল করে' তোলে। ফুলের বুকে হাত দিয়ে স্পর্শ নিই, বুকে জড়িয়ে ধরি ; কিন্তু আগের মতো সেই স্নিগ্ধ কোমলতা কোথায় ? সেই প্রশান্ত মাধুরী ? আজ মনে হয়, ফুলের অংগে ঘিরে কার যেন তপ্ত অনুরাগে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠে সকল দেহ। আনমনে বসে' বসে' ভাবি —অন্ধের বুকে আজ আলোকের তীব্র এ পরশ কেন ? আমি অন্ধ যামিনী-বধূ ; আমার কেন আজ এ উন্মাদনা প্রভাতগগনে চেয়ে

থাকবার? এ চক্ষুহীনের চক্ষুষ্মানের তীব্র দৃষ্টির আকাংখা কেন? এ ভুবন আজ আমার চোখে দৃশ্যমান হ'তে চায় কেন? প্রাণ আমার আজ কি চায়? কা'কে চায়? যাকে চায় তাকেও আমি বিগত ষোল বৎসর ধরে'ই জানি, চিনি। কিন্তু সেই জানা-চেনার মধ্যে কোনো বিশেষত্ব ছিলো না। সে আমার বাল্যের ধূলি-খেলার আর কৈশোরে ফুল তোলার সাথী ছিলো; এক পাড়ায় বাস, চিরপরিচিত সামান্য খেলার সংগী ছাড়া আর তো কিছু তার মধ্যে এতদিন দেখি নাই। বাল্যের, কৈশোরের জীবনে তাকে জেনেছি, তাকে চিনেছি শুধু অনাসক্ত মন-প্রাণ দিয়ে, সরল সুন্দর নির্মলরূপে। মানসিক বা আন্তরিক মাদকতা তার মধ্যে খুঁজে নাই। কিশলয়দা'কে জেনেছি, চিনেছি শুধু প্রতিদিনের পুরানো প্রতিবাসীরূপে; শুধু আমার সমবয়সীরূপে; শুধু স্কুলের ছাত্ররূপে; শুধু আমার হারিয়ে-যাওয়া অচিন পথের পাশ থেকে তুলে' এনে আমাকে বাড়ী পৌছে দেবার সাহায্যকারীরূপে। এর বেশী তো কিছু তার মধ্যে সেদিন জানতে বা বুঝতে পারিনি! কিন্তু আজ এমন হ'লো কেন? কেন আজ তার নামের সাথে এত মাধুরী? আজ তার পায়ের শব্দে প্রাণ চম্‌কে' উঠে কেন? আমার ঘুমন্ত জগতে আজ সে উষার জাগ্রত আলোক নিয়ে এসে কাছে দাঁড়ায় কেন? আমার এ সর্ব অবলুপ্ত জগতের মাঝে, অন্ধকারাচ্ছন্ন অসুন্দর পৃথিবীর মধ্যে কিশলয়দা' আজ সুশ্রী রূপ নিয়ে প্রাণের দ্বারে বারবার এসে সাড়া তোলে।

বুঝতে পারলাম, আমার এ মরে'-যাওয়া প্রাণে প্রাণের বন্যা, রূপের বন্যা এসেছে। আমার এ চক্ষু মরে' গেলেও, চক্ষুর ভিতরে যেন প্রাণের আলোক খুঁজে পেলাম। আমার এ অন্ধ ভুবনে ফুটে উঠলো রবি-শশী, গ্রহ-তারা। সেই গ্রহ-তারার মাঝে দাঁড়িয়ে যেন আমার কিশলয়দা'। তাকে ঘিরে যেন আমার অন্ধ প্রেম, চিরবন্দী আত্মা, চিররুদ্ধ ভালবাসা আজ মুক্তি পেলো। অন্ধের উদগ্র অনুভূতি; চক্ষুহীনের প্রেম যে কি

ভয়ংকর তা চক্ষুষ্মান বুঝবে না; কেউ জানে না যে, সে প্রেম কত অনন্ত অধীর, সে প্রেম আগ্নেয়শিখা সম তীব্র, তীক্ষ্ণ, উত্তপ্ত। সে প্রেমের আলোকে জ্বলে' উঠলো আমার দু'টী অন্ধ-বন্দী চোখ; দেখতে পেলাম, আমার সুন্দর কিশলয়দা' এ সুন্দর পৃথিবীর অপরূপ পুরুষ! আর সুন্দর এই আমি!

আমার সেই পূর্বের শব্দায়মান ও স্পর্শমান জগতে এসে যোগ দিলো তোমাদের দৃশ্যমান ধরা। এখন আমি পরিপূর্ণ অংগ-সমৃদ্ধা, সুন্দরী রূপসী তন্বী তরুণী। সমস্ত বিশ্ব আজ আমার চোখে মূরতি-পরা। দৃশ্যে রূপে, গন্ধে বর্ণে, শব্দে সংগীতে, বাসনা-কামনার আনন্দোৎসবে আমি এখন পরিপূর্ণ ধরার মানুষ। আমার অন্ধ ভুবনে এলো প্রভাতের ইসারা। প্রেম আমাকে ক'রে তুললো সূক্ষ্ম-তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন; দেখতে পেলাম কিশলয়দা'কে আমার চোখের সামনে যেন এক জ্যোতির্ময় প্রিয়-সুন্দর বাঞ্ছিত পুরুষরূপে।

অবশেষে একদিন কিশলয়দা'কে আমার মনের সব কথা, সব ইঙ্গিত বললাম। হেসে উড়িয়ে দিয়ে বললো সে—পাগলি, তোর আবার ভালোবাসা? অন্ধের আবার প্রেম? ক্ষ্যাপা খোঁজে পরশ-পাথর?

বললাম—হাঁ কিশলয়দা', ক্ষ্যাপাই পরশ-পাথর খোঁজে, চক্ষু যার নাই, সেই দেখে সুন্দরকে পরিপূর্ণরূপে; আমি তোমাকে দেখছি যেন এক অতুল পুরুষ, আমার হৃদয়ের দেবতারূপে। আমাকে ঘৃণা করো না তুমি; আমি অন্ধ, এ অপরাধ নিয়ো না। আমি বিশ্বের উপেক্ষিতা হ'তে পারি, কিন্তু তা বলে' তোমার উপেক্ষিতা হ'তে পারবো না। আমি চক্ষু পেয়েছি, তোমার প্রেমের আলোকে আমার চক্ষু খুলে' গিয়েছে। এই দেখ, তোমাকে কেমন সুন্দর দেখছি; শত রবিকর ঝলমল করছে তোমার দেহে। আমি আলোক পেয়েছি, আমি মুক্ত; আমার আঁধার নিশি কেটে গেছে। আমি তোমার মতোই এখন

এ সুন্দর ধরার সুন্দর মানুষ। আমাকে অন্ধ বলে' আর উপেক্ষা করো না কিশলয়দা' !

কিন্তু থাক্ সে সব কথা। পেলাম না কিশলয়দা'কে। অনেকের মতোই সেও পাশ কাটিয়ে গেলো আমার জীবনপথ থেকে ; চির অন্ধ যে, তার সংগে নাকি জীবনের মিল হয় না ; আঁখির সাথে আঁখির মিলন যেখানে, সেখানেই নাকি জীবন সমৃদ্ধ। দৃষ্টি দিয়ে দৃষ্টিসুধাপান যেখানে, সেখানেই নাকি প্রাণ হয় মধুর। আমার মতো একটা বিরাট্ বেদনাকে সে তার জীবনের সাথী করতে পারে না। সে চায় নয়নসুন্দর মেয়ে। হ'লও তাই ; বিয়ে করলে সে সবিতাকে ; মেয়েটীর ডাগর দু'টী চোখের চারু চাহনি চাঞ্চল্য তুললে কিশলয়দা'র বুকে ; দু'টী দীপালী নয়ন দীপালীর আলোক জ্বাললে আমার কিশলয়দা'র অন্তরের মণিকোঠায়। বিয়ে করলে তাকে। সে প্রেমে পড়লো তা'র দু'টী চোখের। ঘৃণা করলো আমার দু'টী দরিদ্র-কাতর, অশ্রুসিক্ত অন্ধ নয়নকে ; তুচ্ছ করলো আমার দু'টী প্রেমসুন্দর আঁখিকে।

বিরহী দু'টী চোখে আমার দু'ফোটা জল নিবিড় হয়ে উঠলো। সেই দু'ফোটা বিরহী জলের ভিতর দিয়ে এ ধরাকে আবার দেখলাম নূতন রূপে। কিশলয়দা'র উপেক্ষা আমায় এক অভিনব দৃষ্টি দিলে। বুঝলাম, কিশলয়দা' উপলক্ষ। মৃগ-কস্তুরীর মতোই এ প্রেম-সৌরভ আমারই অন্তরে বিরাজ করছে। এই অপূর্ব অনুভবের অনুসরণ করে' আবার নিজের মধ্যে ডুব দিলাম। অন্ধনয়ন আর ইন্দ্রিয়বৃত্তির সহজ সংকোচন আমায় সাহায্যই করল। অদৃষ্টপূর্ব এক বেগবান্ জগৎ ভেসে উঠলো আমার অন্তরদৃষ্টির সামনে। ভেসে' উঠলো এক অদৃষ্টপূর্ব জগৎ, যা' অনুভব করা যায়, কিন্তু স্পর্শ করা চলে না। দেখতে পেলাম, এক অসীম প্রেম-প্রবাহ মহাকালের পথ বেয়ে ছুটে চলেছে ; আমার সেই পূর্বের স্পর্শমান, শব্দায়মান ও অধুনা

দৃশ্যমান জগৎ বা তার অনুভূতি-অভিজ্ঞতা আজ আর নাই ; সেখানে আজ মহাপ্রলয় এসে সব চূর্ণবিচূর্ণ করে' দিয়েছে ; সেখানে নাই শব্দ, নাই স্পর্শ, নাই দৃশ্যমান বস্তুস্তূপ ; নাই গীত-গন্ধ-গান ; শুধু এক অদৃশ্য উন্মত্ত প্রবাহ ছুটে চলেছে নিরুদ্দেশ যাত্রাপথে। সবার বক্ষতলে এক বিরাট্ সিন্ধুর আলোড়ন ; শুধু সবুজ-নীল-শ্যাম জলধিপ্রবাহ প্রতি অন্তরে। ছুট্‌বার, মিশ্‌বার, পাবার নীরব বিরহ-ব্যথা সবাইকে ক্ষতবিক্ষত করে' তুলেছে ; যেতে হবেই, পেতে হবেই। কোথা যাবে ? কাকে পাবে ? সে প্রশ্নের অবসর নাই ; কেবলই চলা আর পথ-চলা। আদিহীন, অন্তহীন এ পথ ; আদিহীন, অন্তহীন এই জীবন ; আদিহীন, অন্তহীন এ পথে চলার প্রেরণা ; আদ্যন্তহীন এই বিরহ।

কে কিশলয়দা' ? কোথায় সে ? কে আমি ? কোথায় আমি ? সবাই আমরা ভেসে চলেছি অসীম বিশ্বের বিরহ-প্রবাহে ; কোথায় এর শেষ কে জানে ? শেষে বুঝতে পারলাম, এ বিরহ-অশ্রু শুধু আমার নয়, চরাচরময় না-পাওয়ার এই বেদন ঝরছে। না-পাওয়ার বেদনাতেই পৃথিবীর এ সব ব্যস্ত আয়োজন ; এই উঠা-পড়া, ভাংগা-গড়া, ধ্বংস-প্রলয়। বার বার সৃষ্টি, বিরহ আর প্রলয়।

পেলাম না কিশলয়দা'কে। কিন্তু পেলাম এক সুন্দর, নির্মল, ভাস্বর চেতনাকে ; পেলাম এক সূক্ষ্ম-সুন্দর দৃষ্টি ; শুনলাম, বিশ্বময় বেগময় বিরহের বাণী ; বুঝতে পারলাম, আমি শুধু অন্ধ নই ; শুধু আমার চোখে জল নয় ; বিপুল বিশ্বে সবার চোখেই আজ জল ; সবাই কাঁদছে বিরহের কান্না।

কিন্তু এই নিবিড় সংহৃত আত্মচৈতন্য আমাকে নিথর শান্তি ও সান্ত্বনা দিলো।

শিল্পী

দেবীদাস ছবি আঁকে। সে শিল্পী: আরটিষ্ট্। কত বন-উপবন; নদ-নদী-গিরি: গিরি-ঝরণা তার ছবিতে ফুটে বের হয়। কত সূর্যাস্তের রক্তগগন; কত উষা-বিকশিত কুসুম-তপন তার তুলির কোমল পরশে পরিস্ফুট হয়ে উঠে।

শহরের নির্জন এক কোণে তার ছোট নিরালা ঘরখানি; সুন্দর সুসজ্জিত, কোমল পরিশোভিত। নিজের অংকিত ছবিগুলি দে'য়ালের গায়ে ঝুলানো। সারা ঘরটিই যেন একটি চিত্র-প্রদর্শনীরূপে সাজানো। কত সুন্দর সুশ্রী ছবি সে এঁকেছে; কত বিচিত্র বর্ণের ও রূপের মাধুরী তার ছবিতে ফুটে বেরিয়েছে। তার তুলি-ঝর্ণা হ'তে ঝরে' পড়েছে কত নীল সাগর, কত নীল আকাশ, কত অসীম উচ্ছ্বাস। সারাদিন সারারাত সে ঘরখানিতে একা থাকে; একা একা কত স্বপ্ন দেখে; কত সৌন্দর্য-ঝলকে তার দু'টী চোখ ঝলসিত হয়; অন্তরে কত আকুল প্রেরণা; মনে অসীম কল্পনা, প্রাণে অসীম বন্যা: সে যেন দিনরাত ছুটে চলেছে কোন সুন্দরের সুদূর আহ্বানে। তার সমস্ত তনুতল আকুল উৎসে ভরা; আকুল রসে টলমল। তার নয়নের স্বপ্ন, মনের কনক-কল্পনা প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে ফুটে বের হচ্ছে তার তুলিতে মুরতি পরে'। সে নিজেই অবাক হয়ে দেয়া'লের গায় ঝুলানো ছবিগুলির দিকে চেয়ে থাকে। ঐ সূর্যাস্তের ছবিটা তার সব চেয়ে ভালো লাগে যেন। সূর্যদেব পশ্চিম সমুদ্রে আস্তে আস্তে ডুবে যাচ্ছে। আধখানি সূর্য জলের তলে ডুবে গেছে, বাকী আধখানি হ'তে রক্তরশ্মি ঝরে' পড়ছে; পশ্চিম আকাশ রক্তাভায় জ্বলছে যেন।

দেবীদাস সেদিকে চেয়ে কত কথা ভাবে; ভাবে সে কত বড় একটা জীবন্ত সত্যের ছবি এঁকে তুলেছে তার তুলির সুনিপুণ বর্ণ-সিঞ্চনে।

তার হাতের সরু চিক্কণ সূক্ষ্ম কোমল অংগুলি কতবড় একটা সত্যের সুন্দর আবিষ্কার করে' রেখেছে। সে আপন মনের কল্পনার দিকে চেয়ে অধীর আনন্দে ভরে' উঠে। বাস্তবিক সে শিল্পী, সে স্রষ্টা, সে একটা বিরাট ঐশ্বর্য। গর্বে উল্লাসে সচেতন হ'য়ে উঠে সারা বক্ষস্থল।

সহসা তার মনে কি যেন একটা ছায়া এসে পড়ে। কি যেন একটু সন্দেহ সংশয় মনের কোণে ঘুরে' বেড়ায় প্রচ্ছন্নরূপে। আবার অস্তগামী সূর্যের দিকে নয়ন সূক্ষ্ম দৃষ্টি ফেলে চেয়ে থাকে। অনেকক্ষণ পর আপন মনে বলে' উঠে—সত্যই কি এ ছবিটি সত্যের রূপ পরা? গভীর প্রশ্ন জাগে মনে। ছবিতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, সূর্যদেব যেন সত্যই সমুদ্রের জলে ডুবে গেছে। কিন্তু একি সত্য? সূর্য কি সত্য সত্যই জলে ডুবে যায়?

ঐ সমুদ্র-জল-কল্লোল হ'তে সূর্যদেব লক্ষ মাইল দূরে, সুদূর পশ্চিম সন্ধ্যা কোলে অজানা এক অদৃশ্যমান পথ বেয়ে ছুটে চলেছে—কোথায়? কে জানে। সে যে চোখ দিয়ে সূর্যটিকে জলের ভিতরে ঢুকতে দেখেছে, তার সে চোখ, তার সে চোখের স্বপ্ন। তার তৎকালীন মনের কল্পনা, সত্যই কি নগ্ন নয়? ডুবে-যাওয়া সূর্যকে তখন সে যে দৃষ্টিভংগিতে দেখছে; তার চোখের কিরণ-রশ্মি, তার কল্পনার কনকরশ্মি তখন সূর্যের ডুবে-যাওয়া পথে যে গতিতে বা যে আলোকে ভ্রমণ করছে, তা কি সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়? সমুদ্রজলের সীমা ছাড়িয়ে বহু লক্ষ কোটী মাইল দূরে অবস্থিত রবির অস্তগামী পথের নাগালের অনেক পিছনে ছিলো তখন তার নয়নের দৃষ্টি, কল্পনার সৃষ্টি; তার চোখের সীমা ও কল্পনার সীমা ছিলো শুধু ঐ সমুদ্রের জলরেখা পর্যন্ত; সেই জলরেখা ছাড়িয়ে বহুদূরে সূর্যের ডুবে-যাওয়া পথে পৌছাতে পারে নি; সেই পথের সোনার ধূলি হ'তে বহু পশ্চাতে ঘুরে ফিরে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছে তার দৃষ্টি; তার কল্পনার গতি। ফিরে এসে সাগর জলেই দেখেছে অরুণের অস্তাচলের

মিথ্যা গতি। কাজেই মিথ্যার কল্পনা রঙে তুলির রং করে' সে যে অস্তগামী সূর্যের ছবি এঁকেছে তাও মিথ্যা হয়ে গেছে বিষাদরূপে। তার সমস্ত শিল্পকলা, শিল্পসৌন্দর্য ব্যর্থ হয়ে পড়েছে ঐ ছবিখানিতে।

দেবীদাসের চোখে এলো জল; সত্যই তা' হ'লে সে একটা বিরাট মিথ্যা; শিল্পীরূপে? আর্ট কি তা' হ'লে শুধু আর্ট? সত্যের বহু পশ্চাতে ঘুরে মরা? দেয়ালের গায় আর একখানা ছবির দিকে চোখ তুলে চাইলে—মা ও শিশু। মার কোলে শিশু শুয়ে; ঘুমিয়ে পড়েছে। জননী নিদ্রিত শিশুর মুখচুম্বনরতা। মা চাইছে নিদ্রিত শিশুকে চুম্বন-স্পর্শে জাগিয়ে তুলতে। এ ছবিখানি আঁক্‌বার পূর্বে তার কল্পনা ছিলো নিদ্রিত শিশু যেন জননীর চুম্বনবরষাধারে সহসা জেগে উঠে। কিন্তু তার তুলিতে শুধু চুম্বনরতা জননী ও সেই নিদ্রিত শিশুই ফুটে রয়েছে আজ দশ বৎসর যাবত। কিন্তু কোথায় সে চুম্বন-বরষাঘায়ে জাগ্রত হাসি-মুকুলিত অধর-রাঙা শিশু? কোথায় সে উৎফুল্ল শিশুর জাগ্রত আবির্ভাব? দশ বৎসর আগের নিদ্রিত শিশু আজও নিদ্রিত; সর্ব অংগ চেতনাহীন; তার সেই দশ বৎসর আগের জননী আজও সেই একই চুম্বনরতা; সর্ব শিহরণ পরশন জাগরণহীন চুম্বন। কোথায় শিশুর অংগ-জাগরণ? কোথায় চেতনা? কোথায় উৎফুল্ল বিকশিত জাগ্রত শিশু জননীর কোলে উদয় অরুণ ফোটাবে? কোথায় আনন্দ মুখরিত শিশুর সেই হস্তপদ-সঞ্চালন আর কোথায়ই বা জননীর অধীর আকুল অধরহাসি জাগ্রত শিশুর কচি কোমল সোনার বরণ মুখখানির পানে চেয়ে? শিশু আজও গভীর সুপ্ত; জননী এখনো গভীর চুম্বনরতা। তবে? গভীর প্রশ্ন দেবীদাসকে আচ্ছন্ন করে' তোলে। তবে কি তার তুলির ছোঁয়ায় শিহরণ পরশন জাগরণ নাই? তপ্ত পরশের তুমুল কম্পন নাই? উত্তপ্ত জীবনের অগ্নিশিখা নাই? প্রাণশক্তির প্রাণময় লীলাচঞ্চলতা নাই? তুলির স্পর্শে কেঁপে উঠে না ঐশ্বর্যময়

জীবনীশক্তি ছবির প্রতি অংশ? তুলির প্রতিটি বর্ণধারায় রঞ্জিত হয়ে উঠে না ছবি-অংগের প্রতিটি কোণ? উত্তপ্ত নিঃশ্বাসবায়ু জেগে উঠে না ছবি-অংগ-বক্ষতল হ'তে? নাই কি প্রাণপুঞ্জ রক্তধারা ছবিদেহের প্রত্যেক ধমনীতে? জীবন্ত মানুষের জীবন্ত কথাবার্তা নাই কি ছবি-মনুষ্যদেহের অধরপ্রান্তে? নাই কি প্রাণ? প্রাণের তড়িৎ-শিখা? নাই কি ছবি-দেহে প্রাণের জীবনের উচ্ছ্বাস, আবেগ, অধীরতা, আশা, আনন্দ?

দেবীদাসের সমস্ত অংগে যেন নেমে এলো গভীর বিষাদ; গভীর অবসাদ; বিপুল ক্লান্তিতে যেন তার সমস্ত মনপ্রাণ ভেংগে গেলো। শেষে পলকহীন চোখে দেয়ালের গায় ঝুলানো ছবিগুলির দিকে চেয়ে বললে:

"তুমি কি কেবল ছবি? শুধু পটে লিখা?
ওই যে সুদূর নীহারিকা
যারা করে আছে ভিড়
আকাশের নীড়;
ওই যারা দিন রাত্রি
আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী
গ্রহ তারা রবি,
তুমি কি তাদের মতো সত্য নও?
হায় ছবি, তুমি শুধু ছবি,
চির চঞ্চলের মাঝে তুমি যেন শান্ত হয়ে রও।"

দেবীদাস প্রলয় ক্ষ্যাপামিতে ভরে' উঠলো। তা'র সমস্ত তনুতলে যেন জেগে উঠলো ধূমায়িত অগ্নিশিখা; অসহ্য যাতনা তার বুকে; নয়নে বিপুল ব্যর্থ চাহনি; অবসাদ-আচ্ছন্ন সারা প্রাণ; তবে কি তার এ আজীবন শিল্পসাধনা সর্ব অর্থ তত্ত্বহীন? সর্ব মহিমাহত? এতকাল কি সে শুধু মিথ্যার পশ্চাতে ঘুরে' মরেছে; শুধু এই প্রাণ স্পন্দহীন মৃত ছবি এঁকে এঁকে সে করেছে শিল্পের সাধনা? শুধু এক কায়াহীন ছায়া

নিয়েই এঁকেছে তার জীবনের শিল্পচর্চা ? এ চিরচঞ্চল, জাগ্রত, প্রবহমান, গতিশীল পৃথিবীর কোন রূপই তার ছবিতে ফুটে উঠে না ? গিরি হ'তে ধাবিত ঝরণার কলকল স্ফটিক নির্মল ব্যগ্রগতি সমন্বিত কোন নির্ঝরের ছবিই তার তুলিতে ফুটে নাই ? সুমধুর কণ্ঠনিঃসৃত সংগীত-সমন্বিত কোন বিহংগই তার ছবিতে স্থান পায় নাই ? শত শত নির্ঝরিণীর ধারা সে তার ছবিতে এঁকে রেখেছে ; কিন্তু সবই কল-গতিহীন ; নিশ্চল, নীবব ; প্রাণহীন পাষাণ ; স্তব্ধতায় ভরা। শত শত বিহগ-বিহগী তার তুলিতে স্থান পেয়েছে ; তার শিল্পকলায় রঞ্জিত অলংকৃত হয়েছে, কিন্তু কোথায় সে সংগীতধ্বনিমুখর পাখী ? দে'য়ালের গায় আর একখানা উষা-রবির ছবি। দেবীদাস সে ছবিটার উপর হাত রেখে অনুভব করলো। মানে সূর্যের গায় হাত রেখে উষ্ণতা বিচার করলো ; কিন্তু কোথায় উষ্ণতা ? সূর্য-অঙ্কিত-ছবির বুকে হাত দিয়ে দেখলে ব্যর্থ। নাই তাতে উত্তপ্ত অনুভূতি উষা-সূর্যের কিরণ-কনকপুঞ্জ তপ্ত স্পর্শে ভরা ; কিন্তু সে সব তপ্ত-পরশ-অনুভূতি তার নিজের অংকিত রবিচিত্রে নাই। দেবীদাস সম্মুখের রং তুলিগুলির দিকে চেয়ে শিউরে উঠলো। নির্জীব নিস্পন্দ এই তুলি-অঙ্কিত সমস্ত শিল্পকলা। সত্য জিনিষটাকে সে মিথ্যার আবরণে গড়ে' তুলেছে ; সত্য হ'তে সে বঞ্চিত হয়ে শুধু তুলি দিয়ে নানা রঙ ছবির গায়ে ছিটিয়ে মিথ্যার সাধনা করেছে। তার শিল্প পদে পদে হয়েছে ব্যর্থ। শিল্প সত্য, শিল্প সুন্দর। শিল্পী সে সত্যের সাধক ; সত্য ও সুন্দরের সাধনার নাম শিল্প ; আর্ট। সত্য ও সুন্দরের উপাসক যে, তাকেই বলা হয় শিল্পী ; সত্য ও সুন্দরের প্রতিমূর্তি যখন মূর্ত হয়ে তার ছবির অন্তরে জাগে, তখন সে শিল্পী নামের যোগ্য। তার তুলিতে তখন সত্য ও সুন্দরের ছবি জীবন্ত প্রাণময় প্রতিমূর্তি নিয়ে ফুটে উঠে তখন শিল্পীর শিল্প-সাধনা সার্থক, সত্য, সুন্দর। তখন শিল্পীর শিল্প প্রাণ-প্রাচুর্য নিয়ে জীবিত হয়ে উঠে, তখন ছবি শুধু ছবি

না হয়ে, শুধু লাল নীল রেখার বন্ধনে নিশ্চল, বন্দী, স্তব্ধ, মৌন, মূক না হ'য়ে, অসীম প্রাণশক্তিসম্পন্ন হ'য়ে, জীবন্ত মানুষের মতো মুখে পায় ভাষা, চোখে চাহনি, বুকে কম্পিত নিখিল আশা ও আনন্দ, চিত্তে চারু৹ভাব-বিকাশ, তখনি শিল্প হয় চারু, সত্য, সুন্দর। শিল্পী হয় স্রষ্টা, দ্রষ্টা, নির্মাতা। যে মুহূর্তে শিল্পীর সর্ব সাধনা চিরচঞ্চল গতিশীল জৈব বা বাস্তব সত্যের পৃথিবী থেকে চুল পরিমাণ ভ্রষ্ট, সে মুহূর্তে সে মিথ্যা, অসত্য, অসুন্দর। Art is life and life is artএর থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হ'লে শিল্পীর শিল্পমাধুরী সর্ব চঞ্চলতায় ভরে' উঠে।

দেবীদাস দে'য়ালের গায় ঝুলানো ছবিগুলির দিকে গভীর ব্যর্থ চাহনি মেলে চেয়ে রইলো ; গভীর নৈরাশ্যে ভরে' উঠলো তার সমস্ত অন্তর। তুমি শুধু ছবি? প্রাণহীন ছবি? আর কিছু নয়? দেবীদাস পাগল ক্ষ্যাপামীতে সবগুলি ছবি দে'য়াল থেকে তুলে এনে পদদলিত করে' ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করলো। চাই না প্রাণহীন রেখার বন্ধন ; চাই না ব্যর্থ মসীরেখার বিপুল অর্থশূন্যতা? চাই প্রাণ, চাই ভাষা, চাই সত্য ; চিরসুন্দরের প্রাণময় জ্যোতিঃ ; বুকের জীবন্ত স্পন্দন ; জীবন্ত শিল্প। তবেই আমার শিল্প-সাধনা সার্থক। শিল্প হবে প্রাণময়, প্রেমময়, ফুটন্ত মাধুরীময়। প্রাণের নিঃশ্বাস স্পন্দনেই পরিস্ফুট হয় শিল্প-শ্রী। বাস্তব সত্যেই হবে শিল্প সত্য ; বাস্তব জগতই হবে শিল্প-জগৎ। কিন্তু সে এতদিন কি করেছে? বাস্তবতার নিঃশ্বাস স্পন্দনহীন, বাস্তবতার সর্ব জাগরণ পরশনহীন নিশ্চল নিস্পন্দ প্রতিচ্ছবি এঁকেই সে করেছে শিল্পের বড়াই? কঠিন সত্য সুন্দর উন্মাদ বাস্তবের অকঠিন, অসত্য অসুন্দর অনুন্মাদ প্রতিকৃতি বা প্রতিচ্ছবি এঁকেই সে নিজের শিল্পকে ভেবেছে সর্বসাফল্যমণ্ডিত? সত্যই কি তাই? শিল্পীর শিল্প শুধু ছায়া? শুধু স্বপ্ন? নাই কি তাতে কোন প্রাণ? বাস্তবের কঠোর স্পর্শ?

চলে' গেলো দেবীদাস সুদূর পশ্চিমে ; সে দেশের শিল্প-মনীষিদের সংগে করলো দেখা ; করলো তর্ক বিতর্ক ; কিন্তু মীমাংসা হ'লো না কিছুই। শিল্পের প্রাণ খুঁজে' পেলো না কোথাও। ফিরে এলো আবার দু'বছর পর বাংলায় ; বিশাল ব্যর্থতা নিয়ে বাসা বাঁধলে পুরীতে ; সমুদ্রের তীরে একখানি নির্জন গৃহে। সে অবিবাহিত ; একা। অসীম নিঃসংগ জীবন নিয়ে সে শিল্পের প্রাণ খুঁজে বেড়াতে লাগলো ; সে যেন রিসার্চ করতে লাগলো শিল্পের প্রাণ। শিল্প ও প্রাণ এ দু'য়ের সন্ধিস্থল, এ দু'য়ের মিলন।

কেটে গেলো পাঁচ বৎসর শুধু সমুদ্র দেখে ; সমুদ্রতীরের অসংখ্য বালুকণা দেখে। ঐ নীল অনন্ত জলধারা আর এ উত্তপ্ত বহ্নিবালুকণা— এ দু'য়ের মধ্যে শিল্পের স্থান কোথায়? এ দুই মহাবাস্তবের বুকে শিল্পজ্ঞান কোথায়? শুধু কি জল? শুধু কি নীল স্রোতোধারা? শুধু কি বালুর পাহাড়? শুধু বহ্নিতপ্ত তীব্র ধূলিকণা? আর কিছু নয়? নাই কি এর মাঝে প্রাণস্পন্দন? বিপুল অবসাদে দেবীদাস আবার নুয়ে' পড়ে।

তখন তরুণ ঊষা নবীন আলো নিয়ে উদয় গগনে বিপুল বিকশিত কনককিরণে ফুটে উঠেছে ; সমুদ্রজলরাশি, কনককিরণ-ঝড়ে তরংগ-দোলায় দুলে' উঠেছে। এ পারে অনন্ত বালুরাশি, অরুণ কিরণ শুভ্র-তরংগ যেন ছুটে চলেছে, দিক্‌দিগন্ত অসীম লাবণ্যকম্পে কম্পিত ; তরংগায়িত, জাগ্রত যেন।

কে এক তরুণী সমুদ্রজলে স্নান সমাপন করে' সমুদ্র-সৈকতভূমি বেয়ে' ধীর শান্ত নম্র পদক্ষেপে পথ চলছে। বৈধব্য-ব্যথিত শুভ্র বাস অংগে ; স্নান-অবসানে সিক্ত ; সজল রূপ-সিক্ত-ধারা ; যৌবন-প্রস্ফুটিত তনুরাগ প্রভাতী অরুণের তরুণ রাগে রঞ্জিত। তরুণীর অংগ-জ্যোতিঃ সিক্ত সূক্ষ্ম-বসন-গ্রন্থি ছিন্ন করে' ফুটে বের হয়ে শেফালি-শুভ্র-দ্যুতি-

কণায় সমস্ত সৈকতভূমি প্রাণচ্ছটায় যেন প্রাণবন্ত করে' তুলছে। তরুণীর পদতলে বামপার্শ্বে অনন্ত শুভ্র বালুকাভূমি ; দক্ষিণপার্শ্বে অনন্ত নীল-অম্বুনিধি ; শুভ্র ঊর্মি নৃত্যে রত। মাঝখানে বেলাভূমির নির্জন পথ বেয়ে' চলেছে এ দিব্য রমণী। নয়নে অরুণদীপ্ত অনন্ত চাহনি ; বসনে ভূষণে সর্ব অংগে নিখিল প্রাণের উন্মত্ত ইসারা। দেবীদাস বিস্ময় বিপুল নেত্রে তরুণীর পাণে চেয়ে ; দেবীদাস বিপুল প্রাণ সৌন্দর্য বিমুগ্ধ চক্ষে তরুণীর দিকে চেয়ে ; দেবীদাস গভীর উত্তপ্ত সৌন্দর্য তড়িৎ শিখায় সহসা সমুজ্জ্বল অভিভূত। সে দিব্য দৃষ্টি বিহ্বল হয়ে চারিদিকে চাইছে ; ঐ অনন্ত অম্বুনিধির নীলকম্পনে ভেসে চলেছে যেন অনন্ত প্রাণ ; নীল, শান্ত, স্নিগ্ধ। এ অনন্ত বালুকা-সমুদ্রে ভেসে চলছে যেন অনন্ত শুভ্র প্রাণ। এই তরুণীর প্রাণ-নিঃসৃত অনন্ত প্রাণের ধারা ভেসে' চলছে যেন বিশ্বময়—সমস্ত তরল ও কঠিন জড় পৃথিবীর বুকে প্রাণ সঞ্চার করে'। দেবীদাস যেন দেখতে পেলো সমস্ত চন্দ্র-সূর্য-গ্রহতারা, সাগর-নদী-গিরি, বন-উপবন, তৃণ-তরু, ধূলি-কণা এক অনন্ত প্রাণসৌন্দর্যে কম্পমান, আলোড়িত, ঝংকৃত, মুখরিত ; এবং সেই অনন্ত প্রাণ এ নারী প্রাণ-অংগ হ'তেই যেন শত প্রবাহে ধাবমান। সে যেন দেখতে পেলো সমস্ত জড় ও অজড় সৃষ্টির মূলে রয়েছে এ নারী-প্রাণ ; এ নারী-শক্তি ; এ নারী-জ্যোতিঃ। একমাত্র এ নারীই এ জল-সমুদ্রে, বালুকা-সমুদ্রে ও ইথার-সমুদ্রের বুকে করতে পারে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা। সমস্ত জড়-সুন্দর ও অজড়-সুন্দর বিশ্ব একই। নারীর সূক্ষ্ম প্রাণ সৌন্দর্যে সৌন্দর্যময়। সৃষ্ট বিশ্ববক্ষে প্রাণহীন কোন বস্তু-জগৎ নাই। আকাশের ছুটে-চলা মেঘ, শরতের লাবণ্য সুন্দর চাঁদ, গিরিশিখর ধাবিত নির্ঝরের কলধ্বনি আর পথের এ নীরব ধূলিকণা, সকলি সে এক বিপুল প্রাণকম্পে কম্পমান। শিল্পীর চিত্রপটেও সে একই প্রাণ ঝংকৃত। দেবীদাস আজ যেন অন্তর্দৃষ্টি খুঁজে পেলো ; সে আজ খুঁজে পেলো শিল্প-প্রাণ।

শিল্পীর মণি-রেখা-অংকিত সমস্ত ছবির অন্তরেই রয়েছে এক নিখিল প্রাণের সাড়া ; সে নিখিল প্রাণ হ'তে বিচ্ছিন্ন পৃথিবীর কোন সৃষ্ট বস্তুই নাই ; শিল্পীর শিল্পবস্তুও সে প্রাণেরই প্রতিচ্ছবি ; কিন্তু এ সবাইকে জুড়ে' রয়েছে অনন্ত মহিমান্বিত এ নারী-প্রাণ ; একমাত্র এ প্রাণময়ী নারীই পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টির পশ্চাতে দাঁড়িয়ে সত্য সুন্দর প্রাণের ঝংকার তুলছে। কাজেই শিল্পীর শিল্প শুধু নিঃস্ব জড় তুলির আঘাত নয় ; এ একই নারীপ্রাণে প্রাণময় ও প্রেমময়। সৃষ্টিময়ী নারী, দ্রষ্টা শিল্পী। নারী সৃষ্টি করে প্রাণ, শিল্পী গ্রহণ করে সে প্রাণ তার ছবিতে, তার চিত্রপটে, তার তুলিতে।

দেবীদাস সম্ভ্রমে তরুণীর সম্মুখে দাঁড়িয়ে বললে—আমি শিল্পী ; কিন্তু শিল্পের প্রাণ নারী ; আমার জীবনের সাধনা প্রাণের প্রতিমূর্তি গড়ে' তোলা ; কিন্তু সে মূর্তির অন্তরে তোমাকেই সংগোপনে গড়ে' তুলি ; আমার সমস্ত জীবন সাধনা শুধু তোমাকেই পাওয়া।

তরুণী হেসে বললে—আমি পতিমৃতা, শুভ্রবসনা, বিধবা। এ অনন্ত বালুকারাশির তপ্ত নিঃশ্বাসবহ্নি আমার সারা অংগে ; বসনে, ভূষণে।

দেবীদাস বললে—মিথ্যা কথা ; আমি যেন দেখছি, ঐ অনন্ত নীল জলধারার নীল শ্যামস্রোতে ভেসে চলেছে তোমার সমস্ত তরুণ অংগের প্রাণ-প্রবাহ ; তীরে এ অনন্ত বালুসমুদ্রের অরুণদীপ্ত বক্ষ জাগ্রত নিঃশ্বাস নিয়ে জেগে উঠেছে তোমারি প্রাণ-নিঃশ্বাস-ঝড়ে। আমি যেন দেখছি তোমার ঐ শুভ্র বাস-পরিহিত অংগ অন্তরে লক্ষ সৃষ্টির জীবন্ত উৎসব ; আগত ও অনাগত সৃষ্টির আদি জননী তুমি।

তরুণী হেসে দেবীদাসের হাতে হাত মিলালো ; সমুদ্রের তীরে দু'জনে বাঁধলো বাসা। এক বৎসর পর দেবীদাস তরুণীর কোলের শিশুটির দিকে চেয়ে হেসে বললো—শিল্পপ্রাণ আজ মুক্তি পেয়েছে তোমার অংগে।

তরুণী হেসে শিশুর অধরে ঢাললো প্রাণসিক্ত পুষ্প-চুম্বন; বললো—সৃষ্টিময়ী নারী, পুরুষ শিল্পীরূপে শুধু দ্রষ্টা।

দেবীদাস আজ আবার তূলি ধরলো প্রায় দশ বৎসর পর; দশ বৎসরের সাধনার পর আজ শিল্প-প্রাণ খুঁজে পেলো। তরুণীর কোলে শিশুটিকে তুলির সূক্ষ্ম রেখায় ফুটিয়ে তুললো। পরিস্ফুট প্রাণবন্ত শিশু জননীর বুকে। দেবীদাস আজ মুগ্ধ, সে যেন দেখলো—নারীর বুকে প্রাণ। তার ছবির অন্তরে সূক্ষ্ম জাগ্রত প্রাণ। দেবীদাস বলে উঠলো—

তুমি ছবি?
নহে নহে, নও শুধু ছবি।

মনের পরশ

সকালে পাঁচটার সময় উঠিয়াও রাণুর নিস্তার নাই; কত কাজ যে চারিদিকে ছড়াইয়া থাকে—না দেখিলে বিশ্বাস করা যায় না। এক মুহূর্তও চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার সময় নাই। স্বামী স্ত্রী হইলে কি হইবে? এ সংসারে বাহিরের লোক আর পাঁচ সাতজন; সকলেই যোগেশের ফার্মে কাজ করে। মাহিনা সামান্য পায় বলিয়াই যোগেশ উহাদের খাইবার ব্যবস্থা নিজের ঘরেই করিয়াছে। এত বড় একটা ঔষধ-ফার্মের মালিক যোগেশ; পাঁচ সাত জন লোক খাইবে ইহাতে তাহার কোন আপত্তিই নাই। কাজেই রাণু সকালে যে পাঁচটায় উঠিয়া রান্না ঘরে ঢুকে, রান্নাবান্নার কাজ সারিয়া সকলকে খাওয়াইয়া নিজে খাইয়া বাহির হইয়া আসিতে বেলা দুইটা তিনটা বাজিয়া যায়।

সকালে উঠিয়াই আগে উনান ধরাইয়া আলুসিদ্ধ আর ভাত চাপাইয়া দিতে হয়; তাহা না হইলে যোগেশের চলে না। সকালে সাতটায় ফার্মে যাইতে হয়; আবার ফিরিয়া আসিতে বেলা একটা হইয়া যায়। চা খাইয়া কি এতক্ষণ থাকা যায়! তা' ছাড়া চা-খাওয়া যোগেশ একেবারেই পছন্দ করে না। রাণু যদি কোনদিন বলে, আজ না হয় একটু চা খাও। যোগেশ মুখ ফিরাইয়া বলে, ও-সব বদ্-অভ্যাস।

আলুসিদ্ধ ও ভাত নামাইয়া আবার চা করিতে হয়। রাণু আবার চা না খাইয়া থাকিতে পারে না। আধুনিক বড়লোকের ঘরের মেয়ে; ছোটবেলা হইতে চা খাওয়ার অভ্যাস, চা না খাইলে রাণুর মাথা ধরে। তা' ছাড়া ভোর বেলা ঘুম হইতে উঠিয়াই কতগুলি ভাত খাওয়া—এ অত্যন্ত আধুনিক রুচিবিরুদ্ধ। বিশেষ করিয়া তাহার মত আই. এ. পাশ মেয়ের পক্ষে ইহা অত্যন্ত অশিক্ষিতার কাজ।

আজ সকালে রাণু রান্না ঘরে ঢুকিয়াই দেখিল, গত রাত্রির উচ্ছিষ্ট বাসনগুলি যে যেখানে বসিয়া খাইয়াছে, সেখানেই পড়িয়া রহিয়াছে। ঠিকা চাকরটা কাল রাত্রিতে আসে নাই। রাণুর গা জ্বলিয়া উঠিল ; ঠিকা চাকর দিয়া কি এ হোটেলের কাজ চলিতে পারে ? সব কাজই নিজের করিতে হয়, কেবল বাসন ধোওয়া-মাজার জন্য একটা লোক রাখা হইয়াছে ; সেও মাসের মধ্যে দশদিন কামাই করে। এখন এসব কাজ করে কে ? সব সময়ের জন্য একটা লোক রাখা যায় না ? তাহাদের কি টাকা পয়সার অভাব ? একটির জায়গায় দশটি লোক রাখা যায়। যুদ্ধ বাধিবার পর হইতেই ফার্মের আয় দশগুণ বাড়িয়াছে ; এক টাকার ঔষধ দশ টাকা। এবার নাকি তিরিশ চল্লিশ হাজার টাকা লাভ হইবে। তবুও কি একটা চাকর সকল সময়ের জন্য রাখা যায় না ? টাকাটাই কি সব ? সে কি কিছুই না ? লোক রাখিবার কথা বলিলেই যোগেশ বলিয়া উঠে—আমি নিজে পরিশ্রম ক'রে কাজ ক'রে খেতে শিখেছি, তুমিও তাই শেখো। হ'লেই বা বড়লোকের মেয়ে, নিজের কাজে লজ্জা কি ?

রাণুর আপাদ-মস্তক জ্বলিয়া উঠে ; কাজ করিয়াই যদি খাইতে হয় তবে বড়লোক হইবার অর্থ কি ? সবাইকে কি কুলী-মজুরের মত খাটিয়া খাইতে হইবে ? রাণুর চোখে জল আসিতে চায়, শেষে নিজেই বাসনগুলি ধুইতে আরম্ভ করে। শীতকালের ভোরবেলা, জলগুলি এত ঠাণ্ডা যে, নিমিষের মধ্যে তার হাতের আংগুলগুলি অবশ হইয়া উঠে ; বুকের তলায়ও যেন কি এক কম্পন জাগে। সাথে সাথে হেনার পত্রের কথা মনে পড়িয়া যায়। হেনা তাহাকে পত্র লিখিয়াছে! কত কথা লিখিয়াছে! তাহার নাকি এতটুকুও কাজ করিতে হয় না, কাজ করিলেও স্বামী রাগ করে ; রাগ করিয়া কথা বলে না। তবু যদি সে কোনদিন স্বামী অফিস হইতে আসিলে

তাড়াতাড়ি দুইখানা লুচি ভাজিতে যায়, তবে নাকি হীরেনবাবু তাহাকে বুকের কাছে তুলিয়া ধরিয়া—মুখে চোখে গালে চুমা দিয়া ছাড়িয়া দিয়া বলে—যাও, তোমাকে লুচি ভাজতে হবে না; চাকর রয়েছে কি জন্য?

রাণু আর ভাবিতে পারিল না, চক্ষু দুইটী জলে ভরিয়া উঠিল। সেই অশ্রু-কুয়াশার ভিতর দিয়া সুদূর অতীতের সৌধচূড়ার দিকে চাহিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিল মাত্র। শেষে বাসনগুলি ধুইয়া মাজিয়া পরিষ্কার করিয়া সাজাইয়া রাখিয়া দিল। এইভাবে সব কাজ করিতে করিতে রাণুর আজ যোগেশের ভাত রাঁধিতে দেরী হইয়া গেল। যোগেশ দুই তিনবার রান্নাঘরে আসিয়া ভাত রান্নার দেরী দেখিয়া একটু বিরক্তির স্বরে বলিল—বেলা বাজে আটটা, এখনো তোমার রান্না হ'লো না? এতক্ষণ করছিলে কি?

রাণুর আর সহ্য হইল না; সেও তীক্ষ্ণস্বরে উত্তর দিল—করছিলাম আমার মাথা। একরাশি এঁটো বাসন ধু'তে মাজতে কি সময় লাগে? আপনিই হয়ে যায় সব কাজ। তুমি তো আমাকে সারাদিন বসে' থাকতেই দেখো; কাজ করে শুধু দাসী চাকরে।

যোগেশ যেন এতটুকু হইয়া গেল; অত্যন্ত কোমল কণ্ঠে বলিল—ওঃ ঠিকা চাকরটা বুঝি কাল আসেনি; বুড়ো মানুষ, শরীর হয়তো ভাল নেই। থাক্ থাক্, আমি না হয় আরো একটু দেরী করি; তুমি রান্নাটা সেরে ফেলো। আজ একজন মস্ত খ'দ্দের আসবার কথা; হাজার দশেক টাকার মাল কিনবে; তাই একটু সকাল সকাল যাওয়া দরকার ছিলো। তা থাক, একটু দেরী হ'লে কিছু হবে না। এ ভাবেই এবার ফার্মে মোটা লাভ হচ্ছে। হাঁ, এবার তোমাকে নিশ্চয় একটা কুইন্ নেক্‌লেস্; পাঁচ হাজার, সাত হাজার। যত দামই হোক···। বাইরে ফার্মের উন্নতির জন্য আমি যেমন দিনরাত খাটি, তুমিও যদি তেমনি ঘরের কাজগুলি নিজে পরিশ্রম করে' দেখে শুনে করো—তবে আমাদের নাগাল

পায় কে ? চাকর-বাকর দিয়ে কি কাজ চলে ? এ তুমি নিজেও বুঝতে পারো। দেখ তো থালা-বাসনগুলির দিকে চেয়ে—যেন সোনা ঝলমল করছে। গ্লাসটা দেখলে জল খেতে ইচ্ছে করে—এতো পরিষ্কার ! যদিও এটা হোটেল, কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের হোটেল।

সহসা রাণুর রাগ কমিয়া গেল ; কিন্তু তবু অভিমানের সুরে বলিল—যাও, আর প্রশংসা করতে হবে না ; তার চেয়ে একটু চুপ করে' বসো ; ভাত হয়ে গেছে, ফ্যানটা গেলে দিচ্ছি।

যোগেশ বসিল না, রাণুর কাছে আসিয়া তাহাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া মুখের উপর মুখ আনত করিল ; কিন্তু চুম্বন না করিয়া ছাড়িয়া দিয়া বলিল—না, কাজের সময় বিরক্ত করা ভালো নয়, তাড়াতাড়ি ভাতটা নামিয়ে দাও, বেলা হয়ে গেলো ; খ'দ্দের এসে হয় তো ফিরে যেতে পারে। আজ যদি তার কাছে ঐ দশহাজার টাকার মাল বেচতে পারি, সন্ধ্যাবেলা তোমাকে সিনেমায় নিয়ে যাবো।

রাণু যোগেশের সংগে একত্র বসিয়া অনেকদিন সিনেমা দেখে নাই ; যোগেশের নানা কাজ থাকে, বিশেষ করিয়া সন্ধ্যাবেলা ফার্মে লোক-জনদের বেশী ভীড়, অনেক খরিদ্দার আসে, যোগেশের আর সময় হইয়া উঠে না ; কাজেই রাণুকে নানা বন্ধু-বান্ধবীর সংগেই সিনেমায় যাইতে হয়। আজ যোগেশ নিজেই বলিল যে, তাহাকে সিনেমায় লইয়া যাইবে ; এই কথা শুনিয়া রাণু খুব খুশী হইয়া বলিল—কথা ঠিক ?

যোগেশ বলিল—ঠিক।

তারপর যোগেশ তাড়াতাড়ি দু'টী ভাত মুখে দিয়া ফার্মে চলিয়া গেল। সেদিন দুপুরবেলা আর খাইতে আসিল না, খবর পাঠাইল—আজ অনেক কাজ, সেই খরিদ্দারটি আসিয়াছে, দশহাজার টাকার মালও কিনিয়াছে ; তাহার হিসাবপত্র করিতে অনেক রাত হইয়া যাইবে, রাণু যেন তাহার জন্য অপেক্ষা করে না ; সিনেমায় যেন একাই যায়।

রাণুর মন খারাপ হইয়া গেল—রাস্তার ঐ পার্শ্বেই সিনেমা ঘর। এতটুকু একাই যাইতে পারা যাইবে। কিন্তু কথা তাহা নয়, সে এখনও বুড়ী হইয়া যায় নাই যে, খানে সেখানে একা যাইবে! তাহার বয়স অল্প, মাত্র আঠার—কাঁচা বয়স। এ বয়সে কোন স্বামী স্ত্রীকে একা ছাড়িয়া দিতে সাহস করে? এ বয়সের স্ত্রী, স্বামীর একান্ত কাছের ধন, চোখের মণি, বুকের ঐশ্বর্য। কিন্তু তাহার স্বামী তাহা কি বুঝে? সে বুঝে শুধু তার ফার্ম। দিনরাত ঐ ফার্ম লইয়াই ব্যস্ত। ফার্মের কাজ তো রোজই আছে, থাকিবেও চিরকাল, কিন্তু তাই বলিয়া কি একদিনের জন্যও তাহার সংগে সিনেমায় যাওয়া চলে না? শুধু কি ব্যবসা আর টাকাই সব? সে কি কিছুই না? ব্যবসায়ী স্বামী কি এমনই স্ত্রী-উদাসীন? ভালবাসার একটা কথা তাহার মুখ দিয়া এ জীবনে বাহির হইল না। রাণুর চোখে আসিল জল; সে সিক্ত চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল—চাকুরীজীবী স্বামী ও তাহার স্ত্রীর একটা অপরূপ ছবি। অপরূপ ছবি নয় ত কি? স্বামী স্ত্রী হইয়া বাঁচিয়া থাকিতে হইলে এমনি করিয়া বাঁচিয়া থাকাই উচিৎ। পাশের বাড়ীর বীণাদিদিকে দেখিলে হিংসা হয়। স্বামী স্ত্রীতে মিলিয়া পুষ্পোজ্জ্বল কি সমৃদ্ধ জীবন! কি মধুর উচ্ছ্বাসভরা জীবন-সংগীত; ধরায় থাকিয়া কি অনন্ত জীবনস্বর্গ! উহাদের কাছে গা ঘেষিয়া দাঁড়াইলে সুন্দর সুশ্রী মিষ্টি গন্ধ পাওয়া যায়। মনে হয় উহাদের অংগ হইতে ঝরিয়া পড়িতেছে কুসুম-সুবাস। অংগের এই সুবাস কোথা হইতে আসিল? উহাদের দুইটী হৃদয়ের প্রেম-পারিজাত হইতে নয় কি? দুইজনে মিলিয়া প্রাণের কত মিল! সেদিন দেখিলাম, পাশাপাশি দুইজনে বসিয়া রহিয়াছে; বীণাদিদির কোমল কাঁধের উপর অনিলবাবুর বাহু লতাইয়া রহিয়াছে। রেডিও খুলিয়া রবীন্দ্র-সঙ্গীত শুনিতেছে; গানের সংগে যেন প্রাণ মিলিয়া গিয়াছে। মিলিবে না কেন? প্রেম-ভালবাসা-সোহাগ-আদর যেখানে

গভীর সেখানে এমনই হয়। শুধু কি প্রাণেরই মিল? ঘর দুয়ারের দিকে চাহিলেও একটা মিলিত জীবনের সুশ্রীতা খুঁজিয়া পাওয়া যায়। কুশানকরা চেয়ারগুলির দিকে চাহিলে প্রিয়জনের পার্শ্বে গা ঢালিয়া বসিয়া থাকিয়া প্রণয়-সম্ভাষণ করিতে ইচ্ছা হয়। জানালার গোলাপী পর্দাগুলির দিকে চাহিলে মনে হয়, প্রেমময় জীবনের পুষ্পকোমল আভা যেন সেখানে প্রতিবিম্বিত। ঘরের শ্বেতপাথরের শুভ্র মেঝাখানির দিকে চাহিলে চোখের দৃষ্টি খুঁজিয়া বেড়ায় উহাদের জীবনেরই শুভ্রজ্যোতিঃ। হৃদয়ে বাহিরে এমনই উহাদের মিল। তাহা ছাড়া বীণাদিদি রোজ সন্ধ্যায় লেকের ধারে বেড়াইতে যায়; কখনও কখনও সিনেমায়। অনিলবাবুর সন্ধ্যাবেলা কাজ থাকে না। দুইজনে যখন পাশাপাশি হাটিতে থাকে, মনে হয় যেন তাহারা চিরকালের জন্য প্রাণমিলানো সাথী। বীণাদিদিকে কি সুন্দর দেখায় সেই মেঘবরণ শাড়ীখানায়! অস্ত-সূর্যের মৌন রক্তাভা যখন বীণাদিদির শাড়ীখানার উপর আসিয়া পড়ে, মনে হয় মেঘ-নগরে আগুন লাগিয়াছে; সেই আগুনের তপ্ত রশ্মি অনিলবাবুর আদ্ধি-পাঞ্জাবীর উপর আসিয়া যখন ছিট্‌কাইয়া পড়ে, তখন দুইজনেই যেন ফুটিয়া উঠে দেবদেবী হইয়া। এমন দেবদেবী সেও হইতে পারিত। কিন্তু……। রাণু আর ভাবিতে পারিল না। সমস্ত ভাবনা যেন বুকের তলে রুদ্ধ হইয়া আসিতে চাহিল; কিন্তু সে আজ সামান্য একজন ব্যবসায়ী স্বামীর স্ত্রী মাত্র। আজ দুই বৎসর হীরেনবাবুর সংগে হেনার বিবাহ হইয়াছে; হেনা তাহারই বাল্যবন্ধু, সহপাঠিনী। হেনা কি তাহার অপেক্ষা সুন্দরী? মোটেই না।

বিউটী কম্পিটিশনে সেবার সেইই প্রথম হইয়াছিল; হেনা নয়। তবে? রাণু দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া বলিল—অদৃষ্ট!

সন্ধ্যাবেলা রাণু সিনেমায় গেল। যোগেশ আসিল না। একাই গেল; একা যাইবার দুঃখ তাহার চিরকালই থাকিবে। রাস্তায় বাহির

হইয়া সে ভয়ানক নির্জনতা বোধ করিল; রাস্তার এত লোকের মাঝেও সে যেন অসীম একেলা; বার বার যোগেশের কথা মনে পড়িল। রাস্তার এইপার হইতে ঐপারে যাইতেই সে যেন ঘামিয়া উঠিল; কতগুলি জ্বলন্ত চক্ষু তাহার দিকে; চরিত্রহীন এ চোখগুলি তাহাকে যেন বিঁধিয়া মারিল; পুরুষের চোখ যেন অতৃপ্ত কামনা-শিখা। সম্মুখে সিনেমা ঘরের বিজলিবাতিগুলির দিকে সে একবার চাহিয়া লইল; কামনাহীন এ বাতিগুলির উজ্জ্বল আলো তাহার ভাল লাগিল। তাড়াতাড়ি সিনেমার বারান্দায় ঢুকিয়া দুই টাকার একখানা টিকিট কিনিয়া ভিতরে ঢুকিয়া সে যেন হাপ ছাড়িয়া বাঁচিল। এখনো শো আরম্ভ হয় নাই; রাণু চুপ করিয়া বসিয়া আছে; যোগেশের কথা আবার মনে পড়িল, সে যদি এখন পাশে বসিত।

সহসা পাশের সীটের একজন কেরাণীর স্ত্রী বলিয়া উঠিল—স্বামী বুঝি আসেন নি?

রাণু আস্তে জবাব দিল—না, তাঁর কাজ আছে।

—অফিসে বুঝি ভয়ানক কাজ? রাত পর্যন্ত কাজ করতে হয়?

—অফিস নয়, ফার্মের কাজ।

—কিসের ফার্ম?

—মেডিসিন্।

—ওঃ, অষুধের দোকান? তা'তে সংসার খরচ চালিয়ে বাইরের সখ মেটানো চলে? বউটীর মুখে অবজ্ঞার স্বর।

কথা শুনিয়া রাণুর আপাদ মস্তক জ্বলিয়া উঠিল। বউটীকে কয়েকটা কড়া কথা শুনাইয়া দিল। কেন, সিনেমা দেখার অধিকার কি শুধু কেরাণীর স্ত্রীর? ব্যবসায়ী স্বামীর বউ কি শুধু বিনা পয়সায় সংকীর্তন শোনে? আমি তো উদয়শংকরের নাচও দেখেছি দশ টাকার সীটে বসে; ক'জন কেরাণীর বউ তা' দেখেছে?

বউটী লজ্জায় এতটুকু হইয়া গেল।

সেদিন রাত্রে রাণুর আর ঘুম হইল না। কত কথা তাহার মনের কোণে ভিড় করিয়া দাঁড়াইল। চল্লিশ টাকার কেরাণীর বউর যে সম্মান, তাহার সে সম্মান নাই। তাহা না হইলে এ বউটী তাহাকে এমন কথা শুনাইতে পারে? দোকান করিয়া সংসার চালাইয়া বাহিরের সখ মিটানো যায়? দশজন কেরাণীর টাকা রোজগার করিলেও ব্যবসায়ী স্বামীর নাম নাই; দরিদ্র কেরাণীপ্রধান বঙ্গীয় সমাজে তাহাকে সকলেই একটু অবহেলার চোখে দেখে। ব্যবসায়ী স্বামীর টাকা থাকিলে কি হইবে, বর্ত্তমান আধুনিক রুচি ও শিক্ষা যদি তাহার সংগে না থাকে তবে সকলেই তাহাকে নিন্দা করে। সিনেমায় ঐ বউটী যে শাড়ীখানা পরিয়া আসিয়াছে, কমের পক্ষে তাহার দাম পঁচিশ টাকা হইবে। সে মাত্র দশ টাকার একখানা শাড়ী পরিয়া গিয়াছে। কাজেই বউটী তাহাকে এতবড় কথা শুনাইতে সাহস পাইয়াছে। বর্ত্তমান সভ্যতা বাহিরের আবরণে আভরণে; ব্লাউজে শাড়ীতে; প্যাটিকোটে, ভ্যানিটী ব্যাগে, হাই হিল্ সু'তে। কিন্তু এ সব কি তাহার আছে? কাজেই লোকে নানা কথা বলে। বাহ্যিকতা ছাড়া বর্ত্তমান সভ্যসমাজে মিশিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র; কিন্তু তাহার পক্ষে বাহ্যিকতার কোন দরকার ছিল না; স্বামীর যাহা আয়, তাহাতে সত্যের রাণী সাজিয়া থাকিতে পারে; কিন্তু তাহা কি সে পারে? ব্যবসায়ী স্বামীর মতে অধিক মূল্যের পোষাক পরিচ্ছদ একটা মর্ম্মভেদী অপব্যয়। সোহাগভরা বর্ত্তমান যৌবন জীবনটাকে মিথ্যা করিয়া দিয়া, অনিশ্চিত ভবিষ্যতে যৌবনহীন জীবনটাকে এতবড় করিয়া দেখিবার প্রয়োজন রাণু খুঁজিয়া পায় না; বর্ত্তমান সত্যটাকে রুগ্ন করিয়া পিছনের দিকে ঠেলিয়া দিয়া ভবিষ্যতে তাহাকে ঐশ্বর্য্যময় করিয়া তুলিবার আশায় বসিয়া থাকাটা রাণু নিজেও পছন্দ করে না; হীরেনবাবুও কোনদিন পছন্দ করিতেন না। হীরেনবাবুও

চাহিতেন বর্তমানকে লইয়া বাঁচিতে। সহসা আবার রাণুর হীরেনের কথা মনে পড়িয়া গেল। আজ এই নিদ্রাহীন নিঝুম নীরব রাতের অন্ধকার বক্ষে, প্রেমময় হীরেনের পুরাতন পরিচিত মুখখানা আলো-স্বর্যের মত ভাসিয়া উঠিল। এত কাছে পাইয়াও যাহাকে সে হারাইয়া ফেলিয়াছে বহুদূরে ঐ সুদূর রেংগুন সহরে—হীরেনের কর্মস্থলে। এই হীরেনের সংগে ছিল তাহার মনের মিল, রুচির মিল, আধুনিকতার মিল, বাঁচিবার মিল, জীবনের মিল। কিন্তু সে ছন্দ-মিলানো মিল আজ আর নাই। সহসা একটা দমকা হাওয়া কোথা হইতে স্বপনের মত আসিয়া হীরেনকে উড়াইয়া লইয়া গিয়াছে হেনার কাছে, আর তাহাকে এই যোগেশের কাছে; স্বপ্নহীন সুগভীর নিদ্রায় তাহার পাশে শুইয়া এখন সে ঘুমাইতেছে। হাঁ, রাণু সত্যই হীরেনকে ভালবাসিয়াছিল, হীরেনও রাণুকে ভালবাসিয়াছিল। হীরেন কবিতা লিখিতে পারিত, তাহার আগে লিখিতে পারিত না; রাণুকে ভালবাসিয়া কবিতা লিখিতে শিখিয়াছে। ভালবাসিয়া কবিতা লিখিয়া রাণুকে পড়িয়া শুনাইত; রাণু শুনিয়া যদি বলিত—বেশ হয়েছে। তবেই হীরেন নিজকে ধন্য মনে করিত। রাণু মাঝে মাঝে বলিত—আপনার কবিতা কাগজে ছাপতে দেননা কেন?

হীরেন বলিত—পঠিত কবিতা আমি ছাপতে ভালবাসি না; যে কবিতার বাণী তোমাকে পড়ে' শোনাই, সে বাণী কাগজে ছাপিয়ে আর কাউকে শুনাতে চাই না। আমার বাণী তোমার কাছে থাকবে চির নূতন, চির সঙ্গোপন; তোমার আমার কথা জগতের আর কেউ যেন জানতে না পারে। তোমার আমার ভালবাসা সোনার কৌটায় বন্দী একটি সদ্য ফোটা শ্বেতপদ্মের মত নিবিড় পবিত্রময়!

এমনি করিয়া রাণু হীরেনকে পাইয়াছে কাছে; কিন্তু তাহাকে শেষ পাওয়ার দিন আর আসিল না। রাণুর বন্ধু হেনার সাথে হীরেনের

একদিন বিবাহ হইয়া গেল। কারণ সামান্য। হীরেন এম. এ. পাশ করিলে কি হইবে, রাণুর পিতা তখন বেকার হীরেনের কাছে মেয়ে দিতে কিছুতেই রাজী হইল না।

পরদিন সকালে উঠিয়া রাণু দেখিল, একটা লোক কাজে আসিয়াছে; রাণু লোকটার দিকে বিস্মিত চোখে চাহিয়া রহিয়াছে দেখিয়া যোগেশ বলিল—ওকে আমিই আসতে বলেছি; ঠিকে বুড়ো চাকরটা দিয়ে কোন কাজ হয় না। ও আজ থেকে বাসন মাজা, রান্নাবান্না ইত্যাদি সব কাজ করবে। তোমার মতো কলেজে-পড়া ও বড়লোকের আদুরে মেয়ের পক্ষে রোজ সকাল বেলা ভাত রান্না করা নিতান্তই অশোভনীয়। কথাটা যোগেশ রসিকতা করিয়া কহিল। কিন্তু রাণুর একেবারে অসহ্য হইয়া উঠিল। সারারাত এতটুকুও ঘুমাইতে পারে নাই; মনটা এমনিই খারাপ হইয়া রহিয়াছে; যোগেশের এ খোঁচা দেওয়া কথায় সে আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিল; বলিল—আমি কি আর রোজ রান্না করে দিই, রান্না করে ঠাকুর চাকরে; কথার শ্রী দেখ। বড়লোকের আদুরে মেয়ে নিশ্চয়ই ছিলাম; এখন যেমন অদৃষ্ট তেমন জুটেছে। আমার চাকরের দরকার নাই; আমার কাজ আমিই করবো। অত্যন্ত রুক্ষ স্বরে রাণু এই কথা বলিয়া নিজেই রান্না ঘরে ঢুকিয়া উনান ধরাইতে বসিল।

যোগেশ বুঝিতে পারে নাই—এ সামান্য কথাটায় রাণু এত রাগিয়া যাইবে। সে অত্যন্ত অপ্রস্তুত হইয়া এবং মনে মনে লজ্জিত ও দুঃখিত হইয়া আজ সকালে না খাইয়াই কাজে বাহির হইয়া গেল। সারাদিন আর আসিল না। যোগেশ চলিয়া গেলে রাণু চাকরটাকে তখনই বিদায় দিবে ভাবিয়া আবার ঠিক করিল যে, চাকর বিদায় দিলে তাহাকেই হোটেলের কাজ সমস্ত করিতে হইবে; নিজের মনের এত অশান্তির উপর আবার এত পরিশ্রম সে কিছুতেই করিবে না। কিসের জন্য সে

রোজ রোজ এতগুলি লোকের রান্নাবান্না করিবে? তাহার সুখ কোথায়? শান্তি কোথায়? শেষে সে চাকরটাকে বিদায় না দিয়া কাজেই লাগাইয়া দিল। নিজে সামনের ঘরে আসিয়া একা বসিয়া হেনা ও হীরেনের কথা ভাবিতে লাগিল। কত সুখের জীবন এই হেনার! হেনার স্থান তো তাহারই পাইবার কথা ছিল; হেনা কি সে কথা জানে? কখনও না। সে যে হীরেনকে ভালবাসিত, এ কথা সে কোনদিন হেনাকে বলে নাই। জানাজানি করিয়া কেহ কোনদিন ভালবাসে?

এমন সময় দরজায় কে ঘা দিল। দরজা খুলিলে ডাকপিয়ন রাণুকে একখানা পত্র দিয়া গেল। হেনার পত্র। রেংগুন হইতে হেনা রাণুকে পত্র লিখিয়াছে। রাণু পত্র পড়িতে লাগিল:

ভাই রাণু,

মানুষের জীবনে এমন একটা সময় আসে যখন তাহাকে নিজের দুঃখের কথা, অসীম অপরাধের কথা চোখের জলে ভিজাইয়া সকলের কাছে ব্যক্ত করিতে হয়। এখন আমার জীবনে সে সময় উপস্থিত হইয়াছে; আজ চোখের জলে চিঠির সমস্ত অক্ষর ভিজাইয়া তোমার কাছে আমাদের জীবনের সমস্ত অন্যায় অসাবধানতার কথা বলিব ভাবিয়া এ পত্রখানা লিখিতেছি। এতদিন আমাদের জীবনের ছবি যাহা দেখিয়াছ, যাহা বুঝিয়াছ, তাহা যে কত বড় মিথ্যায় আসিয়া মিশিয়াছে সে কথাই লিখিতেছি। বিবাহের পর বধূ সাজিয়া যেদিন ঘর করিতে আসিলাম অত্যন্ত আধুনিক রুচিসম্পন্ন উচ্চ শিক্ষিত স্বামীর সাথে, সেদিন স্বপ্নেও ভাবি নাই স্বামীর সে আধুনিকতার মূলে থাকিবে চোখের জল, থাকিবে অসীম জীবন্ত মৃত্যু-ব্যথা। বর্তমানে আমরা সেই মৃত্যু-ব্যথাই পলে পলে ভোগ করিতেছি। শুনিয়া হয় তো দুঃখিত হইবে যে, আজ ছয় মাস হইল তোমাদের হীরেনবাবুর চাকুরী নাই; আজ সে এক মুষ্টি ভাতের জন্য কত কাংগাল। কি করিয়া আমাদের এই দশা হইল সে

কথাই এখন বলিতেছি। তুমি হয় তো জান যে, আমি কোনদিনও পোষাক-পরিচ্ছদে, বাহ্যিক আবরণে, আভরণে, অত্যধিক ষ্টাইল করিয়া চলিতে ভালবাসিতাম না। বর্তমান নগ্ন সভ্যসমাজে—বিশেষতঃ কেরাণীকুলবাসী বংগসমাজের বধূদিগের মধ্যে যদিও ইহা মারাত্মক রুচি হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তথাপি আমি কেরাণীর বধূ হইয়াও প্রথম প্রথম সে রুচির পরিবর্তন করিয়া সাদাসিধা ভাবেই চলিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। কারণ স্বামীর অল্প আয় অনুযায়ী ঘরের গৃহিণী যদি তদনুরূপ ব্যয়ভার সংকুচিত না করিয়া চলে, তবে সে ঘরের ভবিষ্যৎ দিনগুলি মরুশিখার মতই নিতান্ত ভয়াবহ হইয়া উঠে। আমাদেরও তাহাই হইয়াছে। আমি সামান্য সূতার কাপড় পরিয়াই থাকিতে ভালবাসিতাম; যে সূতার কাপড় পরিয়া, হাতে সামান্য যে শাঁখা পরিয়া আমাদের অতীত ভারত-বধূরা রাজদরবারে উচ্চ স্থান পাইয়াছে, আমিও স্বামীর কাছে তাহাই দাবী করিয়াছিলাম; কিন্তু সে বিদ্বান, শিক্ষিত; বর্ত্তমান সভ্যতার ছাঁচে গড়া; আমার সে সমস্ত সাজ-পোষাক সে কখনও পছন্দ করিত না; আমাকে নিতান্ত সেকালের অসভ্য বলিয়া ঘৃণা না করিলেও অনেক সময় আমার উপর রাগ করিত। কাজেই আমি বাধ্য হইয়া ষ্টাইল করিয়া চলিতে শিখিলাম। সূতার কাপড় ও শাঁখা ছাড়িয়া অত্যন্ত আধুনিক বেশ ধরিলাম; ষাট সত্তর টাকা দামের অত্যন্ত পাতলা মিহি সূক্ষ্ম শাড়ীর গোলাপী আঁচল দিয়া বক্ষস্থল অর্ধ-নগ্ন করিয়া ঢাকিতে শিখিলাম; ব্লাউজের বুকের বোতাম ইচ্ছাপূর্বক শিথিল করিয়া লাগাইতে শিখিলাম; শাঁখা সিন্দূর ছাড়িয়া দিয়া আধুনিকার বেশ ধরিলাম; ঘোমটা নামমাত্র না দিয়া চুলের খোঁপা নগ্নস্কন্ধে ঝুলাইয়া দিলাম। কপর্দকহীন ভ্যানিটী ব্যাগ হাতে বা কাঁধে ঝুলাইয়া চলিতে চলিতে হাত এবং কাঁধ ব্যথা করিয়া ফেলিলাম; দশজনের সংগে সমান ভাবে সিনেমা, থিয়েটার দেখিয়া; ঘরের সমস্ত কাজ দাসী চাকর

দিয়া করাইয়া অনাবশ্যক বন্ধু-বান্ধব ডাকিয়া আনিয়া টি-পার্টি করিতে শিখিলাম। আমাকে সাজাইতে যাইয়া সেও তেমনি সাজিয়া নানা অপব্যয় করিয়া বর্তমান সভ্যতার বাহ্যিকতা রক্ষা করিতে সুরু করিয়া দিল। এদিকে ঋণের মাত্রা দিন দিন বাড়িয়া উঠিল। ইহার পর একদিন অফিস হইতে আসিলে তাহার হাতে দেখিলাম, একটা কালো বোতল; জিজ্ঞাসা করিলাম, বোতল কিসের? বলিল—মদ। শুনিয়া গা শিহরিয়া উঠিল; বলিলাম—মদ কেন? বলিল—খাব। তারপর কর্কশ অট্টহাসি তুলিয়া বলিল—মরিবার সময় মদই মহৌষধ। মদ খাইয়া মরিতে পারিলে এ ধরায় জীবন ধন্য হয়। ভয় পাইতেছ? আজ এই প্রথম নয়, মদ আমি আজ ছয়মাস যাবত ধরিয়াছি, আজও এক বোতল খাইয়া আর এক বোতল লইয়া আসিয়াছি—খাইবে? খাও। বড় আরাম, বড় শান্তি! বলিয়া বোতলটা আমার সামনে বাড়াইয়া ধরিল। বোতলটা হাত হইতে জোর করিয়া আনিতে গেলাম কিন্তু পারিলাম না, আমাকে জোরে ঠেলিয়া দিয়া সামনের ড্রেসিং টেবিলটার উপর ফেলিয়া দিল। কাচের আয়নাটা ভাংগিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। ভীষণভাবে কপালের কাছ দিয়া কাটিয়া গেল। রক্ত দেখিয়া বলিল —রক্ত! এত লাল! এত তাজা! ঋণের মত এত বিভীষিকাময়! বলিয়া আবার বিকট হাসিয়া উঠিল। ভয়ে চুপ করিয়া রহিলাম। যাক্ সে সব কথা বলিয়া আর কাজ নাই, ভাল যে সে আমাকে না বাসিত তাহা নয়, তবে দারিদ্র্যের পীড়নে দেবতার মত স্বামীও দানব হয়। আমার স্বামী না হয় দানবই হইয়াছে নিজের অসাবধানতার দোষে, দারিদ্র্যের তাড়নায় ইত্যাদি ভাবিয়া ভাবিয়া মনকে প্রবোধ দিয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

ইহার কিছুদিন পরে আবার শুনিলাম, অফিসের বড় সাহেব তাহার কাজে দোষ ত্রুটী পাইয়া তাহাকে নোটিশ দিয়াছেন; সত্য

সত্যই যেদিন চাকুরী গেল, সেদিন ঘরে ফিরিয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল—হেনা, এখন উপায় কর। উপায় আর কি করিব ভাবিয়া পাইলাম না। শেষে তোমার কথা মনে পড়িল, উপায় এখন তুমিই করিতে পার। বাংলা দেশে ফিরিয়া যাইতে চাই, যদি জাহাজের ভাড়াটা সাহায্য কর। ইতি

তোমার হেনা।

সন্ধ্যাবেলা যোগেশ ঘরে ফিরিয়া আসিল; হাতে ভেলবেটের ছোট একটা কেস্। ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, চাকরটা রান্না করিতেছে আর রাণু সব দেখাইয়া শুনাইয়া দিতেছে। দেখিয়া যোগেশ সন্তুষ্ট হইয়া বলিল, চাকর যে একটা না রাখতে পারি, এমন নয়; একটার জায়গায় দশটা রাখতে পারি: তোমার পক্ষে এতগুলি লোকের রান্না-বান্না করা যে অত্যন্ত কষ্টকর ব্যাপার তা' আমি বেশ জানি, কিন্তু জেনেও চাকর রাখি নি, তার কারণ কি জানো? লোকের চিরদিন সমান যায় না; আজ যে অবস্থায় আছি, দু'দিন পর তা না-ও থাকতে পারে; তখন হয় তো আবার সব কাজ নিজের হাতেই করতে হবে; সে জন্যই তোমাকে আগে সব কাজে পাকা করে' নিলাম; ভবিষ্যতে অবস্থার পরিবর্তন হ'লেও আর কোন ভয় নেই। তোমার মতো লক্ষ্মী যার ঘরে তার আর ভয় কি?

রাণু মনে মনে খুসী হইল এবং অভিমানের সুরে বলিল—থাক্, থাক্; দেবদেবীর সংগে আমাকে তুলনা করে' কাজ নেই, এতদিন পর একটা চাকর রেখে দিয়েই এতো আনন্দ?

যোগেশ বলিল—শুধু আনন্দ নয়; আজ মহাসমারোহের দিন। আজ তোমার কৃপণ স্বামী তার সঞ্চিত ভাণ্ডারের দ্বার খুলে' দিয়েছে। বলিয়া সে ভেলবেটের কেস্ হইতে মুক্তার কণ্ঠহার বাহির করিয়া রাণুর গলায় পরাইয়া দিল। বিস্মিতা রাণু অপলক চোখে যোগেশের দিকে চাহিয়া রহিল। আনন্দোজ্জ্বল তার মুখ; ভাষাহারা, নীরব, সুন্দর!

এইভাবে কতক্ষণ কাটিলে যোগেশ আবার বলিল—আমার দিকে চেয়ে কি দেখছো? জামাটা খুব ময়লা, না? আমি তো চল্লিশ টাকা মাইনের অফিসের কেরাণী নয় যে, পাতলা ফুর্‌ফুরে পাঞ্জাবী পরে' থাকবো; আর ঋণ করে' বউকে ষাট টাকা দামের শাড়ী পরিয়ে সন্ধ্যাবেলা বেড়া'তে বেরিয়ে তার পিছনে পিছনে হাটবো? লোকে দেখে বলবে—স্বামী স্ত্রীতে কি ভালোবাসা। সে-সব লোক-দেখানো ভালোবাসা আমি চাই না। ভালোবাসবো কিছু না বলে', কিছু না কয়ে' অতি সংগোপনে। হ্যাঁ, জামাটা ময়লাই বটে; ব্যবসায়ী মাত্রেরই ধূলো বালির সংগে কারবার। ধান ব্যবসায়ী, চা'ল ব্যবসায়ী, পাট ব্যবসায়ী ও তুলো ব্যবসায়ীর আদ্দির পাঞ্জাবী পরলে চলে না। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ মাঠে মাঠে গরু চরা'ত; মাঠে ঘাটে ধূলার অন্ত নেই; তাকে কি সিল্কের পাঞ্জাবী সাজতো? এত নোংরা কাজ করে'ও সে হয়েছিলো রাধিকা হেন রূপসীর স্বামী। আর সেই রাধিকার প্রেমের ধনে ধনী হয়েই সে হয়েছিলো এ দুনিয়ার রাজা; এ দুনিয়ার প্রেমিক-সম্রাট্। তবে? তবে আমার দোষ কি? তুমিও আমার রাধিকা, তোমার প্রেমে আমিও হবো সম্রাট্, বিশ্ববিখ্যাত। কি সুন্দর দেখায় তোমাকে আজ এ মুক্তার মালায়, মনে হয় রাধিকার রূপ-অংগেই যেন লাবণ্যের ঢেউ। এ রূপ, এ লাবণ্য রাজার ঘরের বাঞ্ছিত; আমার ঘরে তুমি যেন একটা জ্যোতির্ময় বিরাট আবিষ্কার; তোমাকে পেয়ে আমি যেন স্বর্গের দ্বার খুঁজে' পেয়েছি; কিন্তু তোমার প্রেমের কাছে আজ আমার স্বর্গও তুচ্ছ বলে' মনে হয়। তোমার প্রেম আমাকে দাহন কর্‌ছে যেন বিকশিত কুসুমের বহ্নশিখার মতো। তোমার প্রেম আমাকে দিনরাত তাড়া কর্‌ছে ফার্মের উন্নতির জন্য; ফার্মের আয় যত বেশী হবে, তোমার প্রেমের মূল্য দেবার ক্ষমতা তত আমার বেড়ে যাবে। তাই দিনরাত শুধু ফার্ম নিয়েই ব্যস্ত থাকি; কিন্তু সে ব্যস্ততা শুধু পূর্ণরূপে তোমাকে

পাবার জন্য; নিঃস্ব হয়ে তোমাকে না হারাই এ ভয় সর্বদা মনে আসে। তোমাকে পেয়ে আমি পেয়েছি দিগ্বিজয়ী শক্তি, দেখবে পাঁচ সাত বছরের মধ্যে আমাদের ফার্ম হয়ে উঠবে টাটা আয়রন্ ফ্যাক্টরীর মতো জগদ্বিখ্যাত। টাটার লোহায় গড়ে' উঠছে আধুনিক বড় বড় সহর; পুরাণো জীর্ণ বাড়ীর পরিবর্তে লৌহ-শক্ত পাকা বাড়ী; আমার ফ্যাক্টরীর নব আবিষ্কৃত ঔষধে গড়ে' তুলবো দেশে দেশে নতুন মানুষ, নতুন প্রাণ; বাংলার এ দুর্ভিক্ষ-পীড়িত অস্থি-চর্ম-সার জীর্ণ মানুষের বুকে কর্‌বো নতুন রক্ত মাংস দান; প্রাণময় নবীন মানুষ। তখন সেই নবীন মানুষ ও নবীন সমাজের ভিতর দিয়েই তোমার প্রেমের রূপ বিশ্বময় দেখবো। সাজাহানের প্রেম বিকশিত হয়েছে তার তাজমহলে, তোমার প্রেম বিকশিত হবে নবীন মানুষে, নবীন মনুষ্য সমাজে।

অন্ধকার নিশীথ রাত্রে পথহারা পথিক যেমন উষার আগমনে অরুণের রক্ত আলোকের মাঝে এক জ্যোতির্ময় উন্মেষণের মহত্ত্ব অনুভব করিয়া পূর্বাকাশে আকুল প্রাণের প্রণাম জানায়; আপন মনের অন্ধকারে আপনাকে হারাইয়া ফেলা রাণুও সে প্রকার যোগেশের কথা শুনিয়া এক জ্যোতির্ময় আকাশের নীচে আসিয়া দাঁড়াইল। যোগেশই সেই আকাশে অরুণ হইয়া ফুটিয়া রহিয়াছে; রাণুর চোখের সম্মুখে যোগেশ আজ জ্যোতির্ময় মস্ত আবিষ্কার। রাণু নত হইয়া যোগেশের পদধূলি লইল; তারপর তাহার বুকে মুখ ডুবাইয়া রাখিয়া বলিল—এ মুক্তার মালা আজ তুচ্ছ বলে' মনে হয় তোমার কাছে, এ বক্ষ-সমুদ্রে এতো প্রেম-সুধা? এতো গোপন আয়োজন আমার জন্য? তোমার তুলনা আছে কি? আমায় ক্ষমা করো। বলিয়া হেনার পত্রখানা যোগেশকে পড়িতে দিল। যোগেশ পত্র পড়িতে লাগিল, পড়িয়া শেষ করিয়া দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া বলিল—আজই একশ' টাকা পাঠিয়ে দাও।

একটি মেয়ে

একটি মেয়ে সেদিন আমার মেসে বেড়াতে এসেছিলো—সেদিন কেন, মাঝে মাঝে প্রায়ই আসে। কিছুদিনের জানাশুনা, বিশেষ পরিচিত নয়। বি. এ. পাশ, যুদ্ধের বাজারে অত্যন্ত স্বাধীন হয়ে গেছে: চাকরী করে' সত্তর টাকা মাইনে পায়। একটা ফ্যাক্‌টরীতে কাজ করে, অনেক পুরুষের মধ্যে সে একা মেয়ে টাইপিষ্ট্।

এসে বসতেই মেসের চাকরকে ডেকে বল্‌লাম—চা আর টোস্ট্। মেয়েটির নাম শিখা, সত্যই সে শিখা; পলাশ ফুলের বহ্নিশিখার মতো মেয়েটির রূপশিখা, অপূর্ব সুন্দরী। বিধির নিজ হাতে গড়া সোনার মূরতি। শিখা বললে—কেবল টোস্ট্, কেবল টোস্ট্; বাবা রক্ষে' করো, টোস্টের দরকার নেই বরং একটা চপ। আবার চাকরকে ডেকে বল্‌লাম—টোস্ট্ নয়······চপ চপ; দু'টো চপ আর দু'কাপ চা। শীগ্‌গির।

শিখা বল্‌লে—বাঁচালেন: এক ঘেয়ে কিছুই ভালো লাগে না। রুচির পরিবর্তন চাই—নতুন রুচি, নতুন প্রাণ, নতুন সংগ, নতুন সিনেমা, নতুন প্লট্।

বল্‌লাম, নতুন সংগ মানে?

—মানে, আজ আপনি আমার বন্ধু বা বান্ধব; কাল হয়তো আর একজন।

—নতুন সিনেমা?

—বড়ুয়া, সাইগল, বিশ্বাস, ছায়া, যমুনা, প্রতিমা ইত্যাদির পরিবর্তে আপনি, আমি, সে।

—আর নতুন প্লট্?

—মানে, সিনেমার প্লটের কথাই বলছি। ঐসব পুরোণো প্লট্ আর ভালো লাগে না। মানে—ওসব পুরোণো প্রেম চক্ষের শূল হয়ে উঠেছে ; নতুন রকমের প্রেম চাই। প্রেমের অভিযানে নোবল্-প্রাইজ পাওয়া চাই। কেঁদে কেঁদে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে : নির্জন ঘরের নির্জন বাতায়ন পথে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে নীচে ফুটপাথের দিকে চেয়ে প্রেমিকের অপেক্ষা করা আর চলে না। এসব ভীরু প্রেম করতে করতে অনেক যুবক যুবতীর স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে গেছে দেখেছি। এখন চাই নতুন ধরণের প্রেম—সংগ্রাম-বিজয়ী সৈনিকের মতো স্ফীত উন্নত বক্ষে সাজতে হবে। সারা বিশ্বেই চলছে সংগ্রামের পালা। শক্তি, সাহস আর রাজ্যের পর রাজ্য জয়, আর প্রাণের পর প্রাণ অধিকার। এই তো হ'লো জীবন। প্রেমই শুধু ম্যালেরিয়া রোগীর মতো দিনরাত ভুগে' ভুগে' মরছে। বাঞ্ছিত পুরুষ নীচে ফুটপাথে মোটর নিয়ে দাঁড়াবে, প্রেমিকা উপরে বাতায়ন পথ থেকে লাফিয়ে মোটরে পড়বে ; দু'জনে মিলে চলে যাবে বহুদূর—ঐ কাশ্মীরের ছায়াবীথি-কুঞ্জে। "হনিমুন" করতে। শত কুতূহলী চক্ষের সাম্‌নে।

বল্‌লাম—বিয়ে না হ'তেই কাশ্মীরে গিয়ে হনিমুন !

—বিয়েটা একটা ফর্ম্যাল কাস্টম ; ও-সব অচল হওয়াই উচিৎ। বিয়ে আবার কি ? আমি তোমাকে ভালোবাসি, তুমিও আমাকে ভালোবাসো, এর উপরে কি বিয়ে ? ভালোবাসার মোহিত-মন্ত্র বিয়ের মন্ত্রের চেয়ে অনেক বড়। আমি কিন্তু বিয়ের মন্ত্র মোটেই পছন্দ করি না। না, কি বলেন আপনি ? আপনারও তো এই মত ?

এ প্রশ্নের উত্তরে হাসবো না কাঁদবো, কিছুই ঠিক পেলাম না ; যা হোক এমন সময় চাকর দু'কাপ চা আর দু'টো চপ্ আনলো। বল্‌লাম—আগে খেয়ে নিন।

শিখা চপের এক টুক্‌রো কামড় দিয়ে বাকী অংশটা ডান হাতের দু' আঙুলের অগ্রভাগে চোখের সামনে তুলে ধরে' বল্‌লে—কোন দেশেতে জনম তোর চপ! কোন্ দেশেতে এলি? হ্যাঁ, ভালো কথা: যে-জন্য আজ আপনার কাছে আসা: আমার ইচ্ছে করে হলিউডে গিয়ে নায়িকার পার্ট করতে; আপনি বন্দোবস্ত করে' দেবেন? টাকা পয়সা সব আমার। আমি দেখতেও সুন্দর, নিশ্চয় ওরা আমাকে চান্‌স্ দেবে।

চায়ের কাপটা আমার হাতে কাঁপছে যেন, পড়ে' যাবার ভয়ে রেখে দিলাম। বললাম—কিন্তু অত দূরদেশের সংগে আমার পরিচয় নেই, যদি বলেন তবে শৈলজাবাবুকে বলতে পারি। শৈলজাবাবুর সিনেমা-গল্পগুলি বাংলাদেশের প্রাণ, তাতে কেবল প্রাণময়ী রূপসী নায়িকার অভাব: আপনার মতো মেয়ে সেখানে নায়িকার পার্ট করলে সর্বাংগ-সুন্দর হয়। কিন্তু আপনি ভদ্রঘরের মেয়ে, শিক্ষিতা, বি. এ. পাশ; এ পথে নামতে চান কেন?

শিখা বল্‌লে—কেন, এ পথ কি মহাপাপের পথ নাকি?

বল্‌লাম—লোকে কিন্তু তাই বলে। এ পথে যাওয়া ভারী অন্যায়।

বল্‌লে—কিন্তু এর চেয়ে মহা অন্যায়ের পথে, মহা পাপের পথে যে দিন দিন এগিয়ে যাচ্ছি, সে কথা কি লোকে জানে? জানেন তো আমি একটা ফ্যাক্‌টরীতে টাইপিষ্টের কাজ করছি: সেখানে আমি একাই মেয়ে; কতগুলি লুব্ধ-চিত্ত পুরুষের তপ্ত নয়ন-শিখার তলে আমি পুষ্প-শিখা দিনরাত জ্বলে' পুড়ে' মরছি। তা'ছাড়া ফ্যাক্‌টরীর ম্যানেজার একজন দুর্দান্ত চরিত্রের লোক। চাক্‌রী রাখতে হ'লে তাঁকে সন্তুষ্ট করতে হবেই। মাঝে মাঝে সন্ধ্যার পর তাঁর বাড়ী যেতে হয়। রাত দু'টো তিনটের সময় নিজেই আবার ড্রাইভ্ করে' আমাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে যান। এ কলংক, এ মহাপাপ, এ মহা অন্যায় ভদ্রঘরের

মেয়ের বেশে গোপনে সহ্য করে' যাওয়ার চেয়ে প্রকাশ্যভাবে সিনেমায় নামা আর গায়ে থেকে ভদ্রনাম মুছে' ফেলা সহস্রগুণে ভালো। পেটের দায়ে চাকরীই যদি করতে হয় এবং সে চাকরীতে যদি তিল তিল করে' গোপনে জ্বলে' পুড়ে' মরি, তার চেয়ে সিনেমার জন্য, বাংলার শিল্প-কলা বাঁচিয়ে রাখার জন্য সে কলংকিত প্রাণ বিসর্জন দেওয়াই শ্রেয়ঃ নয় কি?

বাংগালী মেয়ের এ গোপন মৃত্যুর মর্মভেদী কাহিনী শুনতে শুনতে হাতের চায়ের কাপটা একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, ঠাণ্ডা হয়ে গেছে আমার দেহের সমস্ত উত্তপ্ত শিখা। বললাম—এমনি করে' মরণের চেয়ে সিনেমায় গিয়ে একেবারে মরে' যাওয়াই ভালো। নিজে মরে'ও যদি দেশের শিল্প-প্রাণ বজায় রাখতে পারেন, মন্দ কি? আচ্ছা, তা' হ'লে আজ আপনি যান। আগামী রবিবার শৈলজাবাবু আমার এখানে আসবেন, আপনার কথা বলবো।

বললে—বলতে হবে না কিছু। আমি নিজেই আসবো। আমাকে দেখলেই তাঁর পছন্দ হবে। তা'ছাড়া নায়িকার পার্ট নিশ্চয়ই পারবো। এ বয়সে অভাবে পড়ে' গোপনে অনেক প্রেমের অভিনয় করেছি, তাকি কেউ জানে? যেহেতু আমি ভদ্রঘরের মেয়ে। তবে নাচতে জানি না। আর সে অংগ-বাঁকানো কাজটা আমি নিজেও হেট্ করি; নায়িকা আবার নাচতে যাবে কেন নায়কের কাছে। নায়িকার প্রেমমুগ্ধ আত্মাই কি যথেষ্ট নয়? নেচে আবার ভান করা কেন? আচ্ছা তবে উঠি। নমস্কার! হ্যাঁ, আর একটা কথা—প্রথম প্রথম আমার নামটা গোপন রাখতে হবে কিন্তু। অন্ততঃ বন্ধু-বান্ধবরা যেন জানতে না পারে। কারণ এ বিশ্বে গোপনেই চলছে বারো আনা কলংক।

ইন্‌ফ্লুয়েন্স্‌

মীরার সংগে সরলকুমারের যে কি সম্বন্ধ তা সে অনেকদিন ভেবেছে; অনেকদিন পথে একা যেতে যেতে ভেবেছে, কোন কূল-কিনারা খুঁজে' পায় নি। মীরার কথা মনে পড়লেই সে একা থাকতে ভালোবাসে; কোন অন্তরের বন্ধু আসলে সে তখন নানা কাজের ভাণ করে' রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। সোজা মাঠের দিকে গিয়ে একটা নির্জন স্থান দেখে' সেখানে বসে' পড়ে। মীরার কথা নির্জনে বসে' ভাবতেই ভালো লাগে তার। এমন দিগন্ত ব্যাপী সবুজ মাঠ, এমন তৃণ-পত্রের শ্যামল ঐশ্বর্য, এমন উচ্ছ্বাসভরা উন্মুক্ত বাতাস, এমন নিবিড় ঘন সুদূর সুনীল আকাশ আর আকাশের প্রাণবন্ত আলো। মীরার স্মৃতিও যেন এখানে চারু ঐশ্বর্যে ভরে' উঠে।

কিন্তু কেন? মীরার কথা ভেবে তার কি লাভ? মীরা তার কে? শুধু দু'দিনের জানা-শুনা; মীরাদের বাড়ী থেকে সে এম. এ. পড়তো; মীরা পড়তো আই. এ.। তা'তে হয়েছে কি? এমন তো অনেকে অনেকের বাড়ী থেকে পড়ে এবং অনেক বাড়ীতে মীরার মতো মেয়েও থাকে, সে কি তাদের মতোই একজন হ'তে পারতো না? মেয়েদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন? নির্লিপ্ত? আসক্তিহীন? কেবল অধ্যয়নই তপঃ? এম. এ. পাশ করে' সে এখন কর্মক্ষেত্রে ঢুকেছে; ক'লকাতাই তার কর্মস্থান। আর মীরাও চলে' গেছে আগ্রায় একটা স্কুলের মিস্‌ট্রেস্‌ হয়ে। মুছে গেছে সব অতীতের স্মৃতি। এখন সে-সব কথা ভেবে' লাভ কি? সরলকুমার এ প্রশ্নের কোন উত্তর খুঁজে' পায় না।

সরলকুমার কবি। সে কবিতা লেখে কিন্তু কোন কাগজে তা' এখনো ছাপা হয় নি। সম্পাদকের মতে এখনো তার হাত কাঁচা। কিন্তু তা'তে সরলকুমারের কোন দুঃখ নেই। তার কবিতার ভক্ত

একজন আছে—সে মীরা। সরলকুমার কবিতা লেখে, মীরা পড়ে। মীরা পড়লেই সে নিজেকে ধন্য মনে করে। কবিতা লিখে এক কপি নিজের কাছে রেখে, আর এক কপি মীরার কাছে পাঠিয়ে দেয়; আর মীরার পত্রের আশায় পুষ্প-শুভ্র মন নিয়ে বসে' থাকে। মীরার পত্রে নিশ্চয়ই তার কবিতার উচ্চ প্রশংসা থাকবে। ভেবে' সরলকুমার আবার কবিতার কপিটা বার বার পড়তে থাকে:

পরিস্ফুট কুসুমের রূপ-রশ্মি সর্বাংগে মাখিয়া,
কাছে এসে দাঁড়াইবে একদিন সুদূরের প্রিয়া।

বেশ হয়েছে এ লেখাটুক্। মীরা পড়ে' নিশ্চয়ই খুসী হবে। মীরাকে খুসী করতে পারলেই তার কবিতার সার্থকতা। দিনের পর দিন কেটে যায়, মীরার চিঠি আসে না—যত সব বাজে চিঠি আসে। পড়তে ইচ্ছে তো করেই না বরং শরীর রাগে ভরে' উঠে। ছোট বোন পারু লেখে—তার ছেলের অসুখ, পত্রপাঠ কুড়ি টাকা পাঠাতে। বড় পিসিমা লেখেন—তাঁর বড় মেয়ের বিয়ে, পঁচিশটা টাকা তাঁকে সাহায্য করতেই হবে। আত্মীয়স্বজনদের জ্বালায় আর টেঁকা যায় না। দরিদ্র সারা বাংলা দেশ; ঘরে ঘরে দুর্ভিক্ষ, ঘরে ঘরে অভাব, অভিযোগ, অনশন, অর্ধাশন—ক্ষুধিত পীড়িত সারা দেশের ছবি। একেবারে অসহ্য হয়ে উঠেছে।

প্রায় মাসখানেক পরে শেষে মীরার চিঠি আসে। চিঠিখানা পড়বার আগে সরলকুমার কবিতার কপিটা আর একবার ভালো করে পড়ে' দেখে। বেশ সুন্দর হয়েছে। মীরার এ পত্রে নিশ্চয়ই কবিতার প্রশংসা এসেছে।

চিঠি খুলে' পড়তে থাকে। অন্তরে লক্ষ মাণিক্য জ্বলতে থাকে। ক্রমে সে মাণিক্য-আলোতে ঘনিয়ে আসে বরষা-ঘন মনের ছায়া; কালো, সিক্ত। কেবল দুনিয়ার বর্তমান খবর। গান্ধীর জেল, জহরলালের অসুখ, মহাদেব দেশাইএর মৃত্যু। এসব শুষ্ক সংবাদ চিঠিতে লিখে লাভ কি? খবরের কাগজে এ সব সে আগেই জেনেছে।

এসব শুনতে কে চায়? এর মধ্যে নূতনত্ব আছে কি? চিঠি পড়া শেষ হয়ে যায়, সরলকুমারের দেহমন দুঃখে ও রাগে ভরে' উঠে। চিঠিখানা ছুড়ে' ফেলে দিতে গিয়ে দেখে—চিঠির অপর পৃষ্ঠে সামান্য একটু লেখা: আপনার কবিতা পড়লাম, মন্দ হয় নি। কিন্তু বস্তুহীন, শুধু স্বপ্ন। কবিতাটির দেহ আছে কিন্তু সে দেহের ভিতরে জীবনের সত্যস্বর নেই।

সরলকুমারের চোখ দু'টী ছলছল করে' ওঠে; হয় তো গোপনে দু'এক ফোঁটা অশ্রু ঝরে' পড়ে বক্ষতলে। তার কবিতা বস্তুহীন? শুধু স্বপ্ন? প্রাণহীন দেহ? মীরার এই অভিমত? তা'হলে সত্যের কবিতা কি? কাব্য কাকে বলে? কবিতা তো সুন্দরেরই উপাসনা। যা চির সুন্দর, চির আনন্দময়, চির রস-ছন্দে টলমল, পুষ্প-নম্র-পরশ-মাধুর্যে মধুর; দয়িত-তাপিত-পীড়িত মনের অমৃত-আহারই তো কবিতার পুষ্প-শুভ্র-স্বপ্ন-বিলাসী বাণী। তবে? সরলকুমার ক্ষুণ্ণ হয়ে চুপ করে' বসে' থাকে।

সেদিন সরলকুমার অফিস থেকে একটু সকাল সকাল বেরিয়ে পড়লো; বেন্টিক্ ষ্ট্রীট ধরে' এস্প্ল্যানেডের দিকে চললো। সেখান থেকে ট্রাম ধরে' লয়েড্‌স ব্যাংকে যাবে। পারুর স্বামীর একটা চাকরীর খবর আছে, ম্যানেজারের সংগে দেখা করতে হবে।

এস্প্ল্যানেডে যেতেই দেখে—এক ভদ্রলোক একটি গাছের তলায় নানা মাসিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক কাগজের দোকান সাজিয়ে বসে' আছে। চারিদিকে তার লোক ঘিরে' দাঁড়িয়ে সতৃষ্ণ নয়নে কাগজগুলির দিকে চেয়ে আছে; কেউ হাতে দু'একখানা তুলে' দু'এক পৃষ্ঠা দেখে' আবার যথাস্থানে রেখে' দিচ্ছে। পয়সা ব্যয় করে' কেউ কিন্‌ছে না; দেখা গেল, এত ট্রাম বাস ভর্তি এ ঐশ্বর্যশালী এস্প্ল্যানেডের আঙিনায়ও বাংলার শত শত দরিদ্র গোপনে চলা ফেরা করছে।

সরলকুমারও একখানা মাসিক পত্রিকা হাতে তুলে' নিয়ে খুলতেই বেরিয়ে পড়লো "কবিতার বিষয় বস্তু" নামক একটি প্রবন্ধ, লেখিকা

মীরা। সামান্য দু'পাতার প্রবন্ধ। সরলকুমার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই সবটা পড়ে' ফেললো। শেষে কাগজখানা আট আনা দিয়ে কিনে, একটু এগিয়ে গিয়ে মাঠের এক কোণে বসলো। সংগে সংগে গভীর দীর্ঘশ্বাস! বুকটা যেন ব্যথায় ভরে' গেছে। মীরার কাছে তা'হ'লে তার কবিতার কোন মূল্যই নেই? সব অর্থহীন!

অথচ এই প্রবন্ধে কতকগুলি অখ্যাত কবিদের বিষয়-বস্তু নিয়ে মীরার কত উচ্ছ্বসিত প্রশংসা! তার মতে বাস্তব জীবনের কঠোর কঠিন সত্যের ছবি ছন্দে গেঁথে তুললেই আসল কাব্য সৃষ্টি হয়। বহ্নিতপ্ত প্রবন্ধের সাথে সাথে ভর্ৎসনাতপ্ত মীরার মূর্তিও সরলকুমারের চোখের সামনে ভেসে' উঠলো। সে উঠে দাঁড়ালো।

এস্‌প্ল্যানেড থেকে ট্রাম হু হু করে' ছুটে চলছে নানাদিকে; সরলকুমার সেদিকে চেয়ে রইলো। ইচ্ছা হয় ট্রামে বাসে উঠে শহরের অক্লান্ত মানব-প্রবাহ-স্রোতে সে মিশে' যায়; পশ্চাতে পড়ে থাক—এই স্বপ্নময় অর্থহীন মাঠের বিলাসিতা আর মীরার অনল স্মৃতি।

সরলকুমার শেষে সোজা মাঠের উপর দিয়ে হাটতে সুরু করে' চৌরংগীর এক পাশে এসে দাঁড়ালো। চোখের সামনে যেন সিনেমা চলছে। ব্যস্ত পৃথিবীর কর্ম-কোলাহল ধ্বনি। মীরার "কবিতার বিষয় বস্তু" প্রবন্ধটার জীবন্ত সুর যেন এখানে। সারিবন্দী ট্রাম, বাস, ট্যাক্সি, লরি ব্যগ্রগতিতে সব ছুটে চলছে—ক্লান্তিহীন অবিরাম অবিশ্রান্ত গতি। শুধু ওঠা-পড়া, শুধু ছুটে-চলা, শুধু খোঁজ খবর, আকুল-অন্বেষণ, টাকা-পয়সা, ধন-দৌলত, মান-সম্মান ও অমৃতময় সুখের ও দুঃখময় দুঃখের পশ্চাতে। শুধু ক্ষুধা, তৃষ্ণা; শুধু বুক-কাঁপানো চপল-চিত্ত-চাঞ্চল্য হারিয়ে যাওয়ার ভয়ে; অতুল উৎসব, আনন্দ পাওয়ার পুষ্পগন্ধে। মানব-জীবন-প্রবাহ যেন এখানে বিক্ষুব্ধ জলধি-তরংগে বন্যার বেগে ছুটে চলেছে। মনে হ'লো—সমস্ত পৃথিবী যেন একত্র জুটে'

এ চৌরংগীর বুকের উপর ঘা দিচ্ছে; সমস্ত পৃথিবীর ক্ষুধার্ত মানবের অন্তহীন বক্ষের আশা ও নিরাশার খর-প্রবাহ যেন এই রাস্তাটার উপরই ঘাত-প্রতিঘাতে মূর্ত হয়ে উঠেছে। পিচ ঢালা রাস্তা; কৃষ্ণ-কালো বরণ। বেশ সুন্দর মসৃণ; আয়নার মতো ঝলমল। ভিতর দিয়ে যেন সব দেখা যায়। কৃষ্ণের কালো রূপের মাঝে যেমন সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড প্রতিফলিত, চৌরংগীর কালো বুকের মধ্যেও তেমনি বিশ্ব-মানবের বক্ষ-চিন্তা-স্রোত প্রতিবিম্বিত, প্রতিফলিত, ঝংকৃত ও মুখরিত। বিশ্বের লক্ষ লক্ষ মানবের উত্তপ্ত পদ-চিহ্ন এ পথের বুকে। লক্ষ লক্ষ হৃদয়ের লক্ষ লক্ষ আবেগ-শিখা এ পথের কোণে প্রদীপ্ত হয়ে রয়েছে। উন্মত্ত জীবন-গতির উত্তাল-তরংগ-ক্ষত-চিহ্ন দিয়ে এ রাস্তার ইতিহাস রচিত। এ রাস্তার প্রতি ধূলিকণায় লিখিত হচ্ছে অন্তহীন বিশ্ব-ধারার সুগম্ভীর সুকঠিন বাণী ও ছন্দ। আদিহীন অন্তহীন যুগ যুগান্তরব্যাপী মহাকাল সৃষ্টি হচ্ছে এ রাস্তার মূক-ভাষা-সমৃদ্ধিতে। মানব-রচিত ইতিহাস মহাকাল-রচিত এ রাস্তার ইতিহাসের কাছে কত তুচ্ছ, কত অর্থহীন! কে তা' বুঝে? কে তা' কবিতার ভাষায় প্রকাশ করে? কবিতার বিষয়-বস্তু মীরার মতে এ রাস্তার উপরেই ছড়ানো: প্রকৃত কবি-চক্ষুর দরকার তা' খুঁজে বা'র করা।

সরলকুমার শেষে চৌরংগী পার হয়ে এপারে এসে হেটে হেটে লয়েড্‌স ব্যাংকে ম্যানেজারের সংগে দেখা করলে। ম্যানেজার বললে—প্রশংসাপত্র সহ দরখাস্ত করতে বলুন, বিবেচনা করে' দেখবো।

সরলকুমার ক্ষুণ্ণ মনে চলে' এলো। এ বিবেচনা করে' দেখার ফল প্রায়ই ভয়াবহ। চাক্‌রী এখানে হবে না। পারুর কথা মনে পড়লো: দুঃখের জীবন ওর চিরকালের জন্য। কবিতার বিষয়-বস্তুর সুর পারুর জীবনেও পাওয়া গেলো।

কিছুদূর এগিয়ে আর্মি এণ্ড নেভি ষ্টোরের বাড়ীটা। সরলকুমারের

চোখের সামনে বিদ্যুৎ খেলে গেলো—বোমা, বিমান, মেসিন্ গান, ট্যাংক, সমর, সংগ্রাম, হিংসা, বিদ্বেষ, অত্যাচার, উৎপীড়ন, অপসরণ, ধ্বংস, প্রলয়, মৃত্যু। সরলকুমার ভাবলো এই তো কবিতার শ্রেষ্ঠ ছন্দ।

সরলকুমার চলতে লাগলো পার্ক স্ট্রীট্ ধরে'। কিছুদূর এসে বাম-পার্শ্বে প্রকাণ্ড প্যালেস্।

সাহেবের বাস-ভবন। সামনে প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ড, চারিদিকে প্রাচীর ঘেরা। প্রাচীরের গায়ে গায়ে আইভি-লতার সূক্ষ্ম জাল; স্নিগ্ধ সতেজ উৎস। কম্পাউণ্ডের মধ্যস্থলে ফুলের বাগান। নানা দেশী ও বিলাতী ফুলের মহা উৎসব, অজস্র সুরভি-ধারা। মধু-পরিমলমাখা যেন সমস্ত বাড়ীখানা। কত মালি, দারোয়ান, বাবুর্চি, আয়া, চাকর! সুন্দর সমৃদ্ধ ধরার জীবন!

সরলকুমার ভাবলে কিন্তু এ সব স্বপ্ন, সব মিথ্যা। ক'জনের ভাগ্যে ঘটে এ অতুল ঐশ্বর্য? ক্বচিৎ দু'একজন রাজপুত্রের। তার মতো যুগান্তরব্যাপী গলির ভিতরে নোংরা মেসের একতলা ঘরে থেকে রাস্তার ডাষ্ট্‌বিনের পচা গন্ধ শুঁকে বেঁচে থাকে লক্ষ লক্ষ লোক এবং ধরায় এ লক্ষ লক্ষ লোকের জীবন-ছবিই কঠোর সত্য, কবিতার প্রাণ। দিনরাত ঐ মেসের জান্‌লার কাছে বসে' শুধু আমগাছটার ফাঁক দিয়ে ঈষৎ-দৃষ্ট আকাশের দিকে চেয়ে সে স্বপ্ন দেখে, সে কবিতা লেখে:

রাজারকুমার এলো সোনার রথে,
মুক্তা-মাণিক-দ্যুতি ছড়ায়ে পথে।

অথচ তার এ দারিদ্র্যপূর্ণ জীবনের সংগে এ কবিতার ছন্দের কোন মিল নেই। জীবনে তার কঠিন সত্যের ছায়া নিয়ত ঘনীভূত। মেসের ঘরটা ভয়ানক অন্ধকার, আলো-বাতাসের নাম গন্ধ নেই, জান্‌লাটা চব্বিশ ঘণ্টাই খুলে' রাখতে হয়, নচেৎ অন্ধকারে মৃত্যু অনিবার্য। তক্তাপোষটাও ভাংগা, ছারপোকার ডিপো। সামনের আমগাছটা তার

জান্‌লা-সংলগ্ন; গাছের তলায় দুনিয়ার আবর্জনা। ছেঁড়া কাগজ, ছেঁড়া কাপড়ের টুক্‌রা; ভাংগা একটা কেরোসিন তেলের টিন; একটা মরিচা-পড়া পুরাণো জীর্ণ বাল্‌তি; একটা কাঁধ-ভাংগা মাটির কলসী; একটা ছেঁড়া মোজা; হিল খসা একটা জুতা; তার মধ্যে পিঁপড়ের বাসা। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে সকলের আগে চোখে পড়ে এ সব দৃশ্য, মনে হয় দিনটা না জানি কি অকুশলে যায়।

এ সবের ভিতর দিয়েই তার জীবন ছুটে চলেছে নিশিদিন এবং তার এ জীবনই সত্য, সম্পূর্ণ সত্য। তবু সে রাজকুমারের স্বপ্ন দেখে; তাকে দিয়ে তার কাব্য সুরু করে; কেন? লক্ষ লক্ষ যে জীবন আজ দুঃখ-দারিদ্র্যের কঠোর স্রোতে ভেসে চলেছে অনাদরে, লোকচক্ষুর অন্তরালে—তাদের দুঃখের গান কি তার কবিতার প্রাণ হ'তে পারে না? মীরাই সত্য; সে সত্যই বলেছে তার কবিতা শুধু মরুমায়া-ছল; অর্থহীন।

সরলকুমার মেসে ফিরে এলো। সে আজ কবিতার বিষয়বস্তু খুঁজে' পেয়েছে, সে লিখলো:

"দরিদ্রের বক্ষে আজ জ্বলে সদা ক্ষুধা-হোমানল,
হে রাজন্‌, এখনো কি রবে সুপ্ত পুষ্প শয্যাতল?
হের তার জীবনেরে ঘেরি কত ভাঙা আয়োজন,
প্রতিদিন প্রতি পলে ক্ষত করে ছিন্ন তার মন।
ছেঁড়া মোজা, ছেঁড়া জুতা বাল্‌তি কলসী সব ভাংগা,
গৃহে তার ভিড় করে' করে প্রাণ সদা রক্ত-রাঙা।
আবর্জনা মহাস্তূপে কাঁদে তার জীবনের সুর,
হে কবি, হে ধনী, তুমি তারি তরে কর ছন্দ পূর।"

পরদিন সরলকুমার কবিতাটী মীরাকে পাঠালো। মীরা উত্তরে লিখলো:

দরিদ্র বিশ্বের মাঝে এই তব ঐশ্বর্যের বাণী,
চির সত্য রূপ দিয়ে তব কাছে নিল মোরে টানি'।

বি. এ., বি. টি.

বড়বাজার থেকে হ্যারিসন রোড ধরে' হেঁটে আসছি। গায়ে-প্রায় ঠেকে' ঠেকে' ট্রাম-বাসগুলো ছুটে' চলেছে। ফাল্গুনের রৌদ্রে শরীর পুড়ে' যাচ্ছে, ইচ্ছা করে, পাশের ট্রামটায় উঠে পড়ি। কিন্তু পকেট খালি। একটি পয়সাও নেই। ক্লান্ত পায়ে আবার হাঁটি। পায়ের নীচে পিচ্-ঢালা—আগুনে-তাতা রাস্তা; পা পুড়ে' যাচ্ছে, তবু হেঁটে যেতে হবে। পথের দু'পাশে শত শত ভিখারী, দুর্ভিক্ষ-পীড়িত, অনাহারে অর্ধ-মৃত। পথের তপ্ত ধূলায় পড়ে' আছে—উলংগ, বস্ত্রহীন, অন্নহীন। শুক্‌নো কাঠির মত দেহ, ক্ষুধার অনলে দাউ দাউ করে' জ্বলছে—সভ্য-সমাজের চোখের সামনে। আধুনিক সভ্যতাকে উপহাস করে'ই যেন জ্বলছে পথের পাশে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত জীবনের চিতা! ট্রাম-বাস-ভর্তি সহরের লক্ষ লক্ষ সভ্য শিক্ষিত লোক পথের মৃত্যু-দৃশ্য চোখে দেখেও কিছু না ভেবে অনায়াসে চলে' যাচ্ছে! বাংলার ভিখারীরা সত্যই মানুষ কি না, কে তা' ভাবে!

—যতীনদা'!

চম্‌কে' উঠলাম। কে? চেয়ে দেখি, একখানা টু সিটার গাড়ী থেকে নেমে' সাম্‌নে এসে দাঁড়িয়েছে শৈলেন। দেখে আমার চক্ষু স্থির! বিস্ময়ে স্তব্ধ নির্বাক! কিছুক্ষণ চুপ করে' থেকে শেষে বললাম—এ যে রাজপুত্রের বেশ! শান্তিপুরী জরিপাড় ধুতি! সিল্কের পাঞ্জাবী! সোনার বোতাম! সোনার হাত-ঘড়ি! পায়ে পাম্ সু!—এ দারুণ দুর্ভিক্ষের দিনে এত ঐশ্বর্য! লটারির? না কন্‌ট্রাক্টের···?

লজ্জা-নম্র ম্লান একটু হাসি হেসে শৈলেন পকেট থেকে পেন বা'র করে' এক টুক্‌রো কাগজে লিখলো, কর্ণফিল্ড রোড, বালীগঞ্জ।

কাগজের টুকরো আমার হাতে দিয়ে বললে—এখানে বাসা করেছি। কাল আপনার নিমন্ত্রণ রইলো। কি করি, অমী যখন স্বীকার হ'লো না—শেষে এঁকেই পবৃত্ত বিয়ে করেছি। বি. এ., বি. টি. ; চমৎকার নম্র স্বভাব ; বিদ্যার গর্ব-অহংকার নেই।

এ-কথা বলে' টু-সিটারে-বসা মেয়েটীকে দেখালো। দেখিয়ে আবার হেসে বললে—সাক্‌সেস্‌ফুল ম্যারেজ। কি বলেন? অমী তো আই. এ. পড়ে।

কি বলবো ভেবে পেলাম না। শৈলেন বললে, আসবেন তো?

বললাম—বিয়ে করেছো—বেশ! বেশ! নিমন্ত্রণও করলে! কিন্তু কাল আমার বিশেষ দরকারী কাজ আছে, যেতে পারবো না। আমার ছোট বোন অমিয়া উয়োমেন্‌স কলেজে পড়ছে; বোর্ডিংএ আছে। বোর্ডিংএ ভয়ানক বসন্ত হচ্ছে। ওকে অন্য কোন বোর্ডিংয়ে রিমুভ করতে হবে। আর একদিন তোমার ওখানে গিয়ে খেয়ে আসবো। কিছু মনে করো না। তোমার এমন রাজসিক ব্যাপারে নিমন্ত্রণ খাবো না—খাবো কি তবে লংগরখানায় গিয়ে? আচ্ছা, তবে আসি। হ্যাঁ, একটা কথা, বৌকে ভয় করে' চলো না। থাক্ তার বিদ্যে, বিদ্যে থাক্‌লে কি হবে—টাকাই সব। বৌয়ের বিদ্যে আছে, তোমার আছে টাকা। মণি-কাঞ্চন যোগ! জীবন-সংগ্রামে অনিবার্য জয়।

শৈলেন হেসে নমস্কার জানিয়ে টু-সিটারে মেয়েটির পাশে গিয়ে বসলো। বসে' নিজেই ড্রাইভ্ করে' চলে' গেলো। ওর গাড়ীর চাকার চঞ্চল আবর্তন থেকে ঝড়ের বেগে আমার চোখের সামনে ভেসে' এলো পাঁচ বছর আগেকার কাহিনী, ওর জীবনের!

তখন রেংগুনে ক্রকিং ষ্ট্রীটে পাঁচ-ছ' জন বন্ধু মিলে মেস্ করে' আছি। সবাই অফিসে কাজ করি। অল্ ইয়ং মেন। মেসের পাশেই এক ভদ্র-পরিবার বাস করেন। হীরালালবাবু, তাঁর স্ত্রী আর

দু'টি মেয়ে। বড় সমী কলেজে পড়তো; ছোট অমী স্কুলে। আমরা সবাই বাংগালী। সুদূর প্রবাসে পাশাপাশি বেঁধেছি ঘর। একটি মেস—আর একটি ভদ্র-পরিবারের বাসা। দিন-রাত কল-কোলাহলে মুখর অশান্ত চঞ্চল জীবন-উচ্ছ্বাসে ভরা মেস; তার পাশে শান্ত অচঞ্চল স্নিগ্ধ সুনিবিড় জীবনের ছন্দ-ভরা সুন্দর বাসা! দু'টি জীবন-ধারার বাহ্যিক গতি বিভিন্ন হ'লেও আসলে আমাদের জীবন-ছন্দ ছিল এক। একই মহানন্দময় শান্তি আর সুখ-সম্পদে জীবন গড়ে' তোলার উদ্দেশ্য ছিল আমাদের সকলের। কল-কোলাহল-মুখরিত আমাদের জীবন-নদী ওঁদের গভীর অতল জীবন-সিন্ধুনীরে মিশে' অসীম গভীর হয়ে যেতো! আমরা ছিলাম যেন ঝরণার জল—সদা কল-কল, সদা ছল-ছল! ওঁরা ছিলেন মহা-সাগরের বন্যা; আমাদের ক্ষীণ কলকল-ধ্বনি ওঁদের মহা প্লাবনধারায় কোথায় ভেসে যেতো! এমনি করে' আমাদের চঞ্চল উন্মত্ত গতি-ধারা ওঁদের শান্ত-সুশীল প্রবাহ-ধারায় মিশে' হয়ে উঠলো সৌম্য, শান্ত ও সুন্দর!

আমাদের তরুণ-চঞ্চল প্রাণ সত্যই শেষে ওঁদের পরিমার্জিত সুন্দর শিক্ষিত জীবনের স্পর্শে হ'লো সুন্দর। আমরা যেন পেলাম নূতন প্রাণ, নূতন মন, নূতন জীবন—জীবনের কল্যাণময় সুচারু অনুভূতি। সুদূর প্রবাসে বাস করে' প্রাণে প্রাণে অনুভব করলাম, বাংগালী বাংগালীর জীবনে কত বড় সম্পদ্!

যৌবন জীবন-ভরা তরুণদের মেসের পাশে যৌবন-জীবন-ভরা তরুণী মেয়েদের নিয়ে ভদ্রলোকের বাস—বাংলা দেশে—বিশেষ করে' ক'লকাতা শহরে—এ একেবারে বজ্রধ্বনি-ভরা বহ্নি-কল্পনা যেন! এখানে কোন ভদ্র-পরিবারের বাসার পাশে মেসের অবস্থিতি হ'তে পারে না! হওয়া অসম্ভব! ছেলে-মেয়েদের মান-সম্ভ্রমের অরুণোজ্জ্বল আকাশে আষাঢ়ের কালো মেঘ জমে' উঠবে।

কিন্তু আমরা ক্রমাগত তিনটি বৎসর মেস আর বাসা পাশাপাশি বেঁধে বাস কর্‌ছি—ওঁদের অরুণোজ্জ্বল আকাশে কোনদিন বাদল ঘনায়নি। ওঁদের আকাশ আর আমাদের আকাশ একই স্নিগ্ধ, শান্ত আলোয় আলোকিত হয়েছিলো। ওঁদের হাসিতে আমাদের অধরে ফুটতো হাসি ; ওঁদের অশ্রুতে আমাদের চোখে নামতো বর্ষা ! ওঁদের মানে আমাদের মান ; ওঁদের গৌরবে আমাদের গৌরব, ওঁদের অপমানে আমাদের অপমান। ওঁদের জীবনে আমাদের জীবনের ছন্দ ছিল মিলানো। এমনি করে ওঁদের জীবনের সংগে আমাদের জীবনের ছিল ঐক্যতান, ঐক্য ছন্দ, ঐক্য উচ্ছ্বাস, ঐক্য হাসি-কান্না। মেস আর বাসায় মিলে' এক হয়ে অতি সুন্দর বাস-ভবনে পরিণত হয়েছিলো ! আমরা যেন একই পরিবারের ভাই-ভগিনী ! পরকে আপন করে' পাওয়ার এই যে অসীম আনন্দ—অজানা অচেনার সংগে পাশাপাশি ঘর বেঁধে, একে অন্যের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করে' জীবনকে সহজ করে' তোলার যে আনন্দ, তা সেই প্রবাসী-জীবনে অন্তরে অন্তরে অনুভব করেছি ! দেখেছি, প্রবাসী মানুষ অন্তরে অন্তরে একে অন্যের কাছে দেবতার মত। আচারে-ব্যবহারে, আদানে-প্রদানে, মেলায়-মেশায় প্রত্যেকে প্রত্যেকের কাছে পরম কাম্য ! কিন্তু আজ ক'লকাতা সহরে বাসা বেঁধে দেখি, পাশের ঘরের মানুষ চির-ঘৃণিত, অবহেলিত তুচ্ছ-তাচ্ছল্যে ভরা ! অজানা ! অচেনা ! এর কারণ, আমরা এখানে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের কাছে মিথ্যুক, প্রবঞ্চক, ধাপ্পাবাজ, ভণ্ড, কপট ! প্রত্যেকে প্রত্যেকের কাছে ছলনার ছদ্মবেশ-পরা, ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত ! সর্ব আবরণহীন সরল সুন্দর সুশ্রী মানুষের চেহারা যেন আমাদের কারো নেই। কাজেই ক'লকাতা সহরে মেসের পাশে বাসা তো দূরের কথা, বাসার পাশে বাসা—ভদ্র পরিবারের পাশে ভদ্র পরিবার পর্যন্ত যেন ভীষণ সন্দেহের বোমা-ঘাঁটী ! পাশের বাড়ীর লোককে আমরা দেখি

সন্দেহের চোখে—যেন তারা স্পাই! আর প্রবাসী বাংগালী প্রত্যেকে প্রত্যেকের কাছে কবির ভাষায়:

"কত অজানারে জানাইলে তুমি
কত ঘরে দিলে ঠাঁই,
দূরকে করিলে নিকট-বন্ধু
পরকে করিলে ভাই!"

এমনি করে' মেসে আর বাসায় মিলে-মিশে' একত্র আমরা বাস করেছি তিন বৎসর।

একদিন এই শৈলেন ছেলেটি যেচে এসে আমার সংগে দেখা করলো। সকল অংগে জাহাজের খালাসীর মত কালো পোষাকপরা তা'র। কালো রংয়ের ফুল-প্যাণ্ট, কালো হাফ-সার্ট। কয়লার কালীতে সর্বাংগ কালিময়। দেখে মনে হ'লো, এইমাত্র কোনো কয়লার খনি থেকে উঠে এসেছে যেন! আমাকে বল্লো—আপনাদের মেসে আমাকে থাকতে দেবেন?

কি উত্তর দেবো, খুঁজে পেলাম না। ছেলেটিকে অনেকদিন পথে একা ঘুরতে দেখেছি। কে, কোথায় এবং কি কাজ করে জানি না। আজ সব জিজ্ঞাসা করে' জানতে পারলাম, সে সত্যই বিশিষ্ট ভদ্র এবং শিক্ষিত ঘরের ছেলে, লেখা-পড়া শেখেনি! পরিবারের কেউ পছন্দ করে না। মা-বাবা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন সকলের কাছে সে লাঞ্ছিত, বিতাড়িত। ঘরে বিমাতা তাকে দু'চক্ষে দেখতে পারেন না। পিতা সেই বিমাতার ইংগিতে চলাফেরা করেন। ক্লাসে বার-বার ফেল করে' লেখাপড়া ছেড়ে' সে ব্যায়াম-চর্চা করেছে। কিন্তু ব্যায়াম-চর্চায় দেহের উৎকর্ষ-সাধন করে' অন্নবস্ত্রের অভাব ঘুচা'তে পারেনি, বর্মায় এসেছে। গায়ে শক্তি আছে—একটা ফ্যাক্টরীতে শিক্ষানবিশী করতে ঢুকেছে। দিন-রাত লোহাপেটার কাজ; এই শিক্ষানবিশী অবস্থায় মাসে আঠোরো টাকা পায়। তাই একটু আশ্রয় খুঁজছে।

শুনে মায়া হ'লো! বললাম—বেশ, থাকো। আমাদের মেসে কিন্তু আঠারো টাকায় চলবে না। জামা, কাপড়, জলখাবারের জন্য অন্ততঃ আরো দশ টাকা লাগবে।

শৈলেন বললে—আমি জল-খাবার খাবো না। জামা-কাপড়? আমার এই ফ্যাক্টরীর পোষাকেই চলে' যাবে। অসুবিধা হবে না।

তথাস্তু বলে' শৈলেনকে থাকতে দিলাম। মেসের অন্য বন্ধুদের ডেকে বলে' দিলাম—ওর জলখাবারটা আমাদের সংগেই হবে। সে জন্য আলাদা টাকা আমরা নেবো না। কি করা যায়? বিপদে পড়েছে—ভদ্রঘরের ছেলে।

শৈলেন সকাল আটটায় ফ্যাক্টরীতে যায়, সন্ধ্যায় ফিরে আসে। সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রম, লোহা-পেটা কাজ। কিন্তু মুখে তার হাসি লেগেই আছে। ক্লান্তিহীন পরিশ্রম তার মুখে বেদনার রেখা না ফুটিয়ে হাসির রেখাই ফুটিয়ে তোলে। কঠোর পরিশ্রম—তবু ওর সর্বাংগে জ্যোতিঃ আর লাবণ্যের শিখা! চোখের দিকে চাইলে মনে হয়, চোখ-ভরা আলো। দুই বাহুর শিরা-উপশিরা যেন রক্তের জীবন্ত-প্রবাহে ভরা। শৈলেন যেন শারীরিক কঠোর পরিশ্রমের মধ্যে খুঁজে' পেয়েছে বেঁচে থাকার অনন্ত ঐশ্বর্য!

সন্ধ্যায় মেসে ফিরে হাত-মুখ ধুয়ে' জলখাবার খেয়ে সেই চিরন্তন অবিনশ্বর ফ্যাক্টরীর কালো পোষাকে মেসের বারান্দায় চুপ করে' দাঁড়িয়ে থাকে রাত দশটা পর্যন্ত। কারো সংগে কথা বলে না! কোন কথা জিজ্ঞাসা করলে সামান্য দু'-এক কথায় গম্ভীরভাবে জবাব দিয়ে আবার চুপ করে' কি ভাবতে থাকে! মেসে যতক্ষণ থাকে, বেশ হাস্য-মধুর মুখ! কিন্তু যেই এসে এ বারান্দায় দাঁড়ায়, কি যেন বিষম ব্যথা ওর বুকে জেগে ওঠে! তখন ওর দিকে চাইলে মনে হয়—কালো পোষাকের ভিতরে হয়তো সত্যই ওর বুকও বুঝি এমনি কালো! কতদিন বলেছি—

এ অপরিবর্তনীয় পোষাকটার একটু পরিবর্তন ক'রো। কয়লার মতো কালো আবরণ চোখের সামনে কি সর্বদা ভালো লাগে? গম্ভীর ভাবে সে জবাব দিয়েছে—কয়লার এ কালো আবরণের মধ্যে জ্বলছে সোনার প্রদীপ!

বলি—নতুন এসেছো এ মেসে। পাশের বাড়ীর মেয়েদের হয়তো অসুবিধা হয়! তারা এ সময় তাদের বারান্দায় এসে দাঁড়ায় তো, তোমাকে এ অবস্থায় দেখলে তারা ভূতের ভয়ে শিউরে' উঠবে।

তেমনি গম্ভীর ভাবে শৈলেন উত্তর দেয়—সমস্ত মানব-জীবনটাই ভূতের মতো রহস্যময়! সবাই কালো আবরণে ঢাকা। আমার এমন সুন্দর চেহারা, সুন্দর স্বাস্থ্য, সুন্দর যৌবন, সুন্দর অন্তর-চেতনা—তা সত্বেও নিজকে কালো পোষাকে ঢেকে রেখে ফাঁকি দিচ্ছি সবাইকে। এমনি রহস্যময় সংগোপনে থাকি আমরা সমস্ত মানব। মানুষের আসল রূপ—সত্য আর সুন্দর। কিন্তু সেই সত্য সুন্দর মিথ্যার কালো কলংকে ঢাকা। কার সাধ্য মানুষকে খুঁজে' পায়?

হেসে ওর পিঠে চড় দিয়ে বললাম—লোহা-পেটার কাজ করে' করে' মানুষ সম্বন্ধে জ্ঞানও বেশ শক্ত হয়ে উঠেছে দেখছি!

তারপর হঠাৎ একদিন রেংগুন সহরে জাপানী বোমা পড়লো। নিমেষে সহরের কায়া গেল ছায়ার মতো হয়ে! আধুনিক সভ্যতার আনন্দ-উৎসবে গড়া বড় বড় ঘর-বাড়ী, সভাগৃহ, কাছারি, আদালত, স্কুল-কলেজ, মঠ-গির্জা মুহূর্তে হ'লো ধূল্যবলুণ্ঠিত। আধুনিক বিজ্ঞান নিয়ে এলো ধ্বংসের বাণী! মানুষ হ'লো লুণ্ঠিত, বিতাড়িত। বিজ্ঞান-প্রসূত বোমার রথ ছুটলো জয়-যাত্রার পথে; দেবতা হ'লো মানুষ; মানুষ হ'লো দানব; দানবের রথ-চক্রে দলিত হ'লো পৃথিবী! নিমেষে জনশূন্য হ'লো রেংগুন—কে কোথায় পালালো, কে জানে! কোথায় গেল আমাদের মেস, কোথায় মেসের লোক, আর কোথায় বা পাশের বাসা!

বোমার নীচে কেউ পড়লো না। কিন্তু বেঁচে থেকে কে কোথায় আছি, কারো কোন খবর নেই। মনে হ'লো, প্রলয়ের বেগে আমরা যেন কোথায় সব হারিয়ে গেছি!

আমি পালিয়ে এলাম ক'লকাতায়। জাপানী বোমার আতংকে কম্পিত মানব-সভ্যতার আর এক বিশাল বুকে। এখনও ক'লকাতায় বোমা পড়েনি; কিন্তু প্রাসাদ-সদৃশ সহরের বাড়ীগুলির দিকে চেয়ে মনে হয়, কি যেন ভয়ে সব আড়ষ্ট হয়ে আছে! সুন্দর সুসজ্জিত বাড়ীগুলির দিকে চেয়ে নিশ্বাস ফেলি! ধ্বংসের পৃথিবীতে এদের স্থান আছে না কি? পিছনে-ফেলে-আসা রেংগুনের সেই চঞ্চল মেস, সুখ-শান্ত সেই শান্তির নীড় ভেংগে গেছে। কোথায় গেল মেসের বন্ধুরা সব? মোনা, চিত্ত, শান্ত, খোকা, বুলু, রবি—কোথায় বা ফ্যাক্টরীর পোষাক-পরা সেই শৈলেন ছেলেটা! আর কোথায় বা পাশের বাসার হীরালালবাবু, তাঁর স্ত্রী, দুই মেয়ে সমী আর অমী—সব যেন স্বপ্ন! বিপুল ভাংগা-গড়া দিয়ে ঘেরা এ জীবন শুধু ক্ষণিকের ব্যস্ত আয়োজন!

প্রায় দু' বছর হয়ে গেছে ক'লকাতায় এসেছি। সেদিন ট্রামে বালীগঞ্জ যাচ্ছি। পাশের সীটে চেয়ে দেখি, হীরালালবাবু। সানন্দে পুলক শিহরণে বুকখানা ভরে' উঠলো। যাঁকে নিশ্চিত মরণের মুখে ভেবে রেখেছিলাম, তাঁকে ফিরে পেয়ে কি আনন্দ! হীরালালবাবুকে ট্রাম-ভর্তি লোকের মধ্যে সব চেয়ে ভালো লাগলো। হেসে বললাম, জাপানী বোমা তাহ'লে দেখছি একেবারেই ব্যর্থ! কবে এলেন? হেটে? না, জাহাজে?

হীরালালবাবুও তেমনি বিপুল আনন্দে আমাকে ফিরে পেয়ে বললেন—হেটেই এসেছি। পথে ভয়ানক কষ্ট পেয়েছি। অমী তো একদিন পথে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল, চোখ উল্টে যায় আর কি! কিন্তু থাক সে কথা—বালীগঞ্জে বাসা করেছি। সমী এবার বি. এ. পাশ

করেছে, এখন সাপ্লাইয়ে কাজ করছে, অমী আশুতোষে আই. এ. পড়ছে। চলুন বাসায়—ওদের সংগে দেখা করে' আসবেন।

হীরালালবাবুর সংগে সোজা তাঁর বাসায় গেলাম। সমী, অমী দৌড়ে' এসে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে' আমাকে অস্থির করে' তুললো—কবে এলেন? কি করে' এলেন? কেন এলেন? জাপানীদের হাতে পড়লে বুঝতেন, তারা কেমন!

কথায় কথায় সন্ধ্যা হয়ে গেলো, চলে' এলাম।

প্রায় মাসখানেক পরের কথা। মেসে একা চুপ করে' বসে' আছি, হঠাৎ শৈলেন এসে উপস্থিত। মুখে উইল্‌স্ জ্বলছে! দু'হাত তুলে' নমস্কার জানিয়ে বললে—শুনলাম, আপনি এ মেসে আছেন। দেখা করতে এলাম। ভালো আছেন?

ওর দিকে চেয়ে অবাক্ হয়ে গেলাম! সেই শৈলেন! ফ্যাক্টরীর কালো পোষাক-পরা—আজ এই মূর্তি! সিগারেট্ খায়—তাও আমার সাম্‌নে! গায়ের সেই মৃত্যুহীন কালো পোষাকটা কি হ'লো! আজ একেবারে খাঁটি সাহেব! বিলিতী পোষাক! বিস্ময়-নেত্রে ওর দিকে কতক্ষণ চেয়ে রইলাম। শেষে বললাম, তুমি ভালো আছো তো? রেংগুন থেকে কবে এলে? কি করে' এলে? হেটে, না জাহাজে? তা এখানে এসে নিশ্চয়ই চাকরী-বাকরীর সুবিধা হয়েছে।

এক গাল হেসে শৈলেন বললে—এখন আর সেই ত্যজ্যপুত্র নই। ইন্‌ডিয়ান্ আয়রণ ষ্টীল্ ওয়ার্কসের চীফ্ ইন্‌জিনীয়ার। তিন্‌শো টাকা মাইনে পাচ্ছি। হ্যাঁ, যতীন-দা', একটা কথা—আপনার খোঁজে মেয়ে আছে? আমি বিয়ে করবো!

আরো অধিক অবাক্ হয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে হেসে বললাম—ক'লকাতা সহরে আবার মেয়ের অভাব? বিশেষ বালীগঞ্জে।

বালীগঞ্জের কথা বলতেই হীরালালবাবুর কথা মনে পড়ে' গেলো। বললাম—হ্যাঁ হে শৈলেন, হীরালালবাবুও এখানে আছেন। সমী-অমী সবাই। সমী চাকরী করছে, অমী আই এ. পড়ছে।

খানিকক্ষণ চুপ করে' থেকে একটু মলিন হাসিমুখে বললে—'আপনি ওঁদের বাসায় মাঝে মাঝে যান বুঝি?

বললাম—হাঁ, প্রত্যেক রবিবার। আসছে রবিবারেও যাবো। কেন, কিছু দরকার আছে?

কোন উত্তর দিলো না। হাতের আধেক-খাওয়া সিগারেটটা তাচ্ছল্যের ভংগীতে ছুঁড়ে' ফেলে দিয়ে আর একটা সিগারেট্ ধরিয়ে টান দিয়ে চোখ বুঁজে উপরের দিকে ধোঁয়া ছেড়ে' কি যেন রহস্যভরা মন নিয়ে নিঃশব্দে চলে' গেলো।

ঠিক তার পরের দিন আবার এসে উপস্থিত। এসেই আমার হাত দু'টো চেপে ধরে' বিশেষ অনুরোধ করে' বললে—আপনাকে আমার একটা কাজ করে' দিতেই হবে যতীনদা'। আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি, ভক্তি করি। কিন্তু আজ আমার লজ্জা-সরম কিছুই নেই! শুনুন, আমি অমীকে ভালবাসি। আমি জানতে চাই, সে আমাকে বিয়ে করতে রাজী আছে কিনা! এই চিঠি। এ-চিঠিখানা দয়া করে' অমীকে দেবেন —তার হাতে। আর কেউ না দেখে? অমী যেন চিঠির উত্তর আপনার হাতেই দেয়। আমি তাড়াতাড়ি উত্তর চাই। হাঁ, আপনি এ-চিঠি পড়ে' দেখতে পারেন।

আমার সর্বাংগ বয়ে' যেন একটা বোমারু-বিমান উড়ছে! সেই সংগে বোমাও পড়ছে যেন! আমার দেহের রক্ত-চলাচল একরকম বন্ধ। সেই শৈলেনের এই কাণ্ড! অমীকে ভালবাসে! বলে কি? মাথা খারাপ হয়নি তো? রুক্ষ মেজাজে বললাম—তোমার এত দুঃসাহস? আমাকে দিয়ে প্রেমের চিঠি পাঠাবে অমীর কাছে?

বললে—সত্যি যতীনদা', আমি সত্যি অমীকে ভালোবাসি, ভয়ংকর ভালোবাসি। আপনি চিঠিখানা পড়ে' দেখুন—খারাপ কিছু লিখি নি ; ভদ্রলোকের মতোই লিখেছি।

মৃদু স্বরে বললাম—ফিফ্থ্ ক্লাসে পাঁচবার ফেল করেছো ; লেখা-পড়ার কি জানো ? ভদ্রলোকের মতো চিঠি লিখেছো বলছো !

বললে—বিশ্বাস না হয়, পড়ে' দেখুন। হ্যাঁ, আর একটা কথা—অমীকে রাজী করাতে পারলে বিয়ের পরেই আমি দশ হাজার টাকার একটা লাইফ-ইন্‌সিওর করবো আপনাদের ন্যাশন্যাল ইন্‌ডিয়ান লাইফ অফিসে এবং আপনার এজেন্সীতে।

মনটা পাতলা হয়ে গেলো। এজেন্সী করে' মানুষের আয়ু বন্ধক রেখে দু'পয়সা পাই ! একেবারে দশ হাজার টাকা ! বেশ মোটা কমিশন পাবো। আচ্ছা, পড়েই দেখি না, চিঠিতে কি লিখেছে। চিঠি পড়তে লাগলাম :

স্নেহের অমি,

যতীনদা'র কাছে শুনলাম তোমরা ক'লকাতায় আছো,—তোমাদের সংগে দেখা করতে ইচ্ছে করে। বিশেষ করে' তোমার সংগে। আমার কথা তোমার মনে আছে কি ? কত রাতের পর রাত রেংগুনের সেই মেসের বারান্দায় দাঁড়িয়ে কাটিয়েছি শুধু তোমার অপেক্ষায়। তুমি এসে কখন্ তোমাদের বারান্দায় দাঁড়াবে—সেই আশায়। কোন কোন সময় যে না এসেছো, এমন নয় ! চোখে চোখে অনেক কথা হয়েছে। কিন্তু সে-কথা ভালোবাসার কথা কি না জানি না। লেখাপড়া তেমন শিখিনি বলে' তোমার সে চোখের কথার মানে বুঝতে পারিনি। কিন্তু আমার চোখ দিয়ে যে-কথা বলেছি, তার প্রত্যেকটি কথায় গভীর অর্থ ছিলো। তুমি লেখাপড়া শিখেছো—সে-কথার অর্থ নিশ্চয়ই তুমি ধরে' ফেলেছো এবং যা' ধরেছো, তা' সত্য। আমার চোখ ভালোবাসার কথাই

বলতো। বলতো, আমি তোমাকে ভালোবাসি। কিন্তু সে সব কথা থাক—আমি এখন আর সে খালাসীর কালো পোষাক-পরা ফ্যাক্টরীর ওয়ার্কার নই। আমি এখন বিলিতী পোষাক পরে' কাজ করি। একটা মস্ত কার্মের ইন্‌জিনীয়ার। আমি তিন্‌শো টাকা মাইনে পাই। আমি বিয়ে করবো এবং রাতের পর রাত বারান্দায় দাঁড়িয়ে যাকে ভালোবেসেছি তাকেই বিয়ে করতে চাই। এ বিষয়ে তোমার মত জানতে চাই। যতীনদা'র কাছে তোমার মত জানালে সুখী হবো। ইতি

তোমার পাণিপ্রার্থী
শৈলেন

চিঠি পড়ে' হেসে বললাম—মেসের বারান্দায় দাঁড়িয়ে তাহ'লে নীরবে এই কাণ্ড করতে! বারান্দায় দাঁড়াতে মানা করলে এজন্যই বুঝি বলতে—কালো আবরণের ভিতরে জ্বলছে সোনার প্রদীপ! তুমি এত বড় শয়তান! ভাগ্যে সে মেস ভেংগে গেছে—বাসাও ভেংগে গেছে—নাহ'লে তুমি কি যে করতে, ভাবতে গায়ে কাঁটা দেয়! আচ্ছা, দশ হাজার টাকার ইন্‌সিওরেন্সের প্রতিশ্রুতি যখন দিলে, একবার চেষ্টা করে' আমি দেখবো।

পরদিন শৈলেনের চিঠি নিয়ে হীরালালবাবুর বাসায় গেলাম; কিন্তু কি করে' সে চিঠি অমীর হাতে দিই? ভাই-ভগিনী সম্পর্ক ওদের সংগে আমার চিরকাল। ভাই হয়ে বোনের হাতে দেবো ঐ শৈলেনের প্রেমপত্র! বয়ে' এনেছি কি করে'—আর এখন বোনের হাতে সে চিঠি দিই কি করে'? লজ্জায় মাথা নুয়ে' পড়লো। কিন্তু ওদিকে দশ হাজার টাকার কমিশন। চোখ-মুখ বুঁজে চিঠিখানা পকেট থেকে বা'র করে' অমীকে একটু আড়ালে ডেকে বললাম—মেসের সেই শৈলেন তোমাকে চিঠি দিয়েছে। চিঠি পড়ে' আমার কাছেই যা হয় একটা জবাব দিয়ো।

চিঠি পড়ে' অমী টুক্‌রো টুকরো করে' ছিঁড়ে ফেললো চিঠিটা। ছিঁড়ে আমাকে বললে—এত বড় অসভ্য! চিঠিখানা আপনার কাছে দিয়েছে, নিশ্চয় আপনি পড়েছেন?

অপরাধীর মতো বল্‌লাম—হাঁ।

বললে—ছি-ছি, কি লজ্জার কথা! আমি সত্যই ওকে ভালোবাসি নাকি? কক্‌খনো না। শুনুন তবে—একদিন দু'জনেই বারান্দায় দাঁড়িয়েছি—আমি অন্যদিকে মুখ করে' দাঁড়িয়ে—ওর দিকে আমি সহজে চাইতাম না। ও আমায় ডেকে বললে—অমি, এদিকে চেয়ে দেখো, কি সুন্দর ফুল! চেয়ে দেখি, ওর হাতে একটা ক্রিশান্‌থিমাম! চাইতেই ও ফুলটা বুকে চেপে ঠোঁটে ঠেকিয়ে আমার দিকে ছুঁড়ে' দিলে—দিয়ে বললে, খোঁপায় পরো। আমি খোঁপায় না পরে' ফুলটা কাণে গুঁজে' রাখলাম! এতেও ও বুঝতে পারলো না যে, আমি ওর কথা অমান্য করলাম? ওকে অপমান করলাম? কিন্তু থাক সে কথা! এখন সে তিন্‌শো টাকার লোভ দেখিয়ে আমাকে বিয়ে করতে চায়। টাকা অবশ্য ভালোবাসি কিন্তু টাকাই সব নয়! মন বলে' একটা বস্তু আছে। আসল কথা মনের! আমি দু'দিন পরে আই. এ. পাশ করবো! ওর যখন টাকা আছে, পড়াশুনা করে' হয়তো পরে বি. এ., এম. এ.-ও পাশ করবো। শেষে দু'জনের জীবনে ট্র্যাজেডি ঘটবে। সন্দেহ, সংশয়, শংকা, দ্বিধা, দ্বন্দ্ব—পদে পদে ওকে দেবে বাধা। ও ভাববে, আমি কত বড়; আর ও কত ছোটো! একটা মস্ত ব্যবধান গড়ে' উঠবে দু'জনের মধ্যে। দু'জনের মনকে বিষাক্ত করে' দেবে। ও আমার কাছে হারিয়ে ফেলবে ওর স্বামিত্ব। শুধু কাতর ভীত চাহনি নিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে আমার দিকে চেয়ে থাকবে সসম্ভ্রমে। করুণাপরবশ হয়ে হয়তো আমি বলবো—ভয় নেই, কাছে এসে পাশে বসো, এই চেয়ারে। ও হয়তো ভুলেই যাবে আমি ওর স্ত্রী, হয়তো বলবে, আপনি

বসুন আমি দাঁড়িয়ে থাকি। আপনার কাছে চেয়ারে বসতে আমার লজ্জা করে।···এমনি করে' জীবন হয়ে উঠবে পদে পদে বিড়ম্বিত। কে স্বামী, কে স্ত্রী, এ প্রশ্ন মনে জাগবে প্রতিদিন, প্রতি কাজে। ওর টাকা হবে সর্ব-অর্থহীন! তার চেয়ে ওকে বলবেন—আই রিফিউজ।

এসে শৈলেনকে বললাম—অমী রিফিউজ করেছে। দশ হাজার টাকার বীমাটাও ফস্‌কালো হে!

আজ শৈলেন হ্যারিসন রোডের উপর হঠাৎ টু-সিটার থেকে নেমে' আমাকে বললে—কাল আপনার নিমন্ত্রণ! পরশু এঁকে বিয়ে করেছি —বি. এ., বি. টি.! সাক্‌সেস্‌ফুল ম্যারেজ! কি বলেন? অমী তো মোটে আই. এ. পড়ে!

তবুও হ'লো না জানা

অঞ্জন এম. এ. পাশ করে' ক'লকাতায় চাক্‌রীর বাজারে ঘুরে' দেখলে বাজার মন্দা। তার মতো হাজার হাজার বি. এ., এম. এ. পাশ করে' পথে ঘাটে ঘুরে' বেড়াচ্ছে; কেউ ডেকেও জিজ্ঞাসা করে না। পরিচিত যারা, তারাও সাম্‌নে পড়লে সামান্য মুখের আলাপ করে' পাশ কেটে চলে' যায়। যেন বি. এ., এম. এ. পাশ করে' কত বড় অন্যায় ক'রছে। বাংলা দেশের এ দুর্দিনে কোন কিছু পাশ না করে' যারা দু'পয়সা রোজগার করে তারাই বরং সকলের চোখে প্রীতির ও সম্মানের। অঞ্জন দেখলে—চাক্‌রী শীঘ্র হওয়া অসম্ভব। এ অবস্থায় শহরে ক'দিন চলে? মাস মাস মেসের টাকা দিতেই হবে। বেকার অবস্থায় তা' সম্ভব নয়। অনেক ভেবে চিন্তে অঞ্জন একটা টিউশনী নিলে, থাকা আর খাওয়া। ছাত্রীটি ম্যাট্রিক্ দেবে। অন্ততঃ এক বছরের জন্য তার থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হ'লো।

সেদিন বেণু বাংলা বইখানা খুলে' বললে, এ দু'টো লাইন বুঝিয়ে দিন:

"কাছে আছে দেখিতে না পাও
তুমি কাহার সন্ধানে দূরে যাও।"

অঞ্জন বললে, বুঝতে চেষ্টা করো, অতি সহজ মানে।

বেণু কতক্ষণ চুপ করে' থেকে শেষে বললে, কবি বাতাসকে লক্ষ্য করেছেন: বাতাস আমাদের কাছে আছে, অথচ দেখতে পাচ্ছি না।

অঞ্জন হেসে বললে, প্রকৃত কবির কবিত্ব শুধু আকাশে বাতাসে ঘুরে' বেড়ায় না, তার চেয়ে অনেক উপরে বাস করে। কথাটার মানে হচ্ছে—ভগবান তোমার কাছেই, এমন কি তোমার মধ্যেই রয়েছেন, তাঁকে দূরে গিয়ে' খুঁজে' বা'র করতে হয় না। ধরো, তোমার এ বইখানা—এর মধ্যে যত গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা আছে, তার মাঝেই ভগবান

বাতাসরূপে বিরাজ করছেন। এ বইয়ের প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি লাইন থেকে যে ধ্বনি, যে ঝংকার, যে বাণী উচ্চারিত হচ্ছে, তার মধ্যেই তিনি গোপনে গোপনে বিরাজ করছেন। এ জন্যই মনীষীরা বলে' থাকেন—তিনি ধ্বনিময়, বাণীময় ও ঝংকারময়।

বেণু গম্ভীর হয়ে বলে, আপনি বড় সিরিয়াস্। আমার ও-সব ভগবৎ-তত্ত্ব ভালো লাগে না। ভালো লাগে চোখের সামনে যা দেখি, তাই।

অঞ্জন বলে, বেশ, খুব সুন্দর কথা। বাহির বিশ্বের সৌন্দর্যের মাঝেও ভগবান বিরাজ করেন সুন্দররূপে।

বেণুর ছোট বোন ঝর্ণা এসে ডাকে—দিদি, উপরে খেতে এসো। বেণু উপরে চলে' যায়।

অঞ্জন বসে' থাকে একা। দুনিয়ার শত ভাবনা তার মনে এসে জড় হয়। চাকুরীর কথা—এ এক বছরের ভিতরে নিশ্চয়ই তার চাকুরী হয়ে যাবে। হ'লে ভালো চাকুরীই হবে, অন্ততঃ একশো টাকা মাইনে। সরকারী আফিসে চাক্‌রী? না, কিছুতেই সে সরকারের কাজ করবে না। প্রত্যেক শিক্ষিত যুবকেরই ন্যাশন্যাল স্পিরিট্ থাকা চাই। দেশের মানুষ দেশের কথা ভাববে। দেশের উন্নতি, দেশের মান, দেশের গৌরব, দেশের ঐশ্বর্য প্রত্যেক দেশবাসীর ধ্যানের ছবি হওয়া উচিত। যে-কোন একটা জাতীয় ফার্মে সে চাকুরী করবে এবং সে ফার্মের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা ও পরিশ্রম করে' কাজের উন্নতির সংগে সংগে দেশেরও ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করবে, তবেই হবে তার শিক্ষার পরিচয়।

সহসা ডাক-পিয়ন এসে চিঠি দিয়ে যায়। অঞ্জনের বুকটা কেঁপে ওঠে। বড় লম্বা খামে চিঠি। বেকার দারিদ্র্য-পীড়িত জীবনে চিঠি এলেই ভয় হয়। দেশের বাড়ীতে বিধবা মা ও ছোট ছোট দু'টী বোন ও একটি ভাই। হয়তো টাকার জন্য মা চিঠি দিয়েছে, কিন্তু এত বড় লম্বা খামে কেন? হয়তো সংসারের দুঃখ কষ্টের অনেক কথা জানিয়ে

টাকা চেয়েছে। কিন্তু টাকা কোথায়—সে যে বেকার! অঞ্জনের বুকটা আবার দুরু দুরু করে। শেষে অঞ্জন কাঁপতে কাঁপতে চিঠিখানা হাতে তুলে' নেয়। যাক্, বাঁচা গেলো—মার চিঠি নয়। সেদিন একটা কোম্পানীতে চাক্‌রীর দরখাস্ত করেছিল, তারই জবাব এসেছে, উপরে ঠিকানা—ইংরাজীতে টাইপ করা। তবে কি তার চাকরী হয়ে গেলো? এতো সহজে? না হবে কেন? সে উচ্চ শিক্ষিত, এম. এ. পাশ; তার চাক্‌রী হওয়া অতি সহজ। আনন্দে উৎসাহে অঞ্জনের বুক ভরে' ওঠে। প্রতি তন্ত্রতলে আবার যেন শুনতে পায় জীবনের সাফল্যের মৃদু মধু ধ্বনি। আশা ও আনন্দে অঞ্জনের হাত আবার কাঁপতে থাকে, কম্পিত হস্তে চিঠিখানা খুলে' পড়ে। প্রিন্‌টেড চিঠি। লিখেছে—'রিগ্রেট, নো ভেক্যান্‌সি'। অঞ্জনের হাত অবশ হয়ে আসে, চিঠিখানা মাটিতে পড়ে' যায়। ব্যর্থ বক্ষ হ'তে কাতর দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে।

কাছে আছে দেখিতে না পাও
তুমি কাহার সন্ধানে দূরে যাও।

মিথ্যা! সব মিথ্যা! ভগবান নেই, কাছেও নেই, দূরেও নেই। কোথায়ও নেই। দরিদ্রের কাছে, বেকার জীবনের কাছে, ব্যাধি-পীড়িত জরাজীর্ণ আজীবন দুঃখীর কাছে ভগবান নেই। দরিদ্রের ভগবান ঐ যারা ধনী। বেণুরা বড়লোক, অনেক টাকা পয়সা। বেণুকে সুখী করতে পারলেই বরং সে তার দ্বারা নানাভাবে উপকৃত হবে, কি কাজ অন্ধ ভগবানের আশ্রয় নিয়ে। বেণুই বরং তার বেকার-জীবনের ভাগ্যলক্ষ্মী।

* * * *

বেণু ম্যাট্রিক পাশ করলে। কিন্তু অঞ্জনের কিছুই হ'লো না; অর্থহীন বেকার জীবন নিয়ে সে আজও অর্থহীন রইলো। চাকুরী আর কোথাও জুটলো না; সে আবার বেণুকে আই. এ. পড়াতে লাগলো; শহরে খেয়ে' পরে' বেঁচে থাকবার এ সম্বলটুকু হারানো যায় না। কিন্তু সহসা অঞ্জনের জীবনে এলো বৈশাখী ঝড়। হয়ে গেলো ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন। বৃদ্ধা

জননী অনশনে রোগাক্রান্ত হয়ে সহসা মারা গেলেন। অর্ধাশনে ছোট একটি ভাই ও হু'টী বোন তখন তারই দিকে চেয়ে সুদূর পল্লীপ্রান্তে পড়ে' আছে। অঞ্জনের চোখ হু'টী আজ তপ্ত অশ্রু-বন্যায় ভেসে' উঠলো; বুকের তলে আজ তার অসীম বেদনা, অসহ্য ব্যর্থ জীবন-মরু আজ তাকে পলে পলে দগ্ধ করছে; সে আজ কিসের লোভে সামান্য একটা টিউশনি নিয়ে পড়ে' আছে এখানে? হু'বেলা হু'টী খাওয়া ছাড়া সে আর কিছুই পায় না। হাঁ বেণুকে তার বেশ ভালো লাগে, বেণুর আচার ব্যবহার, কথাবার্তা, চাল-চলন সবই যেন তার হৃদয় স্পর্শ করে; সেইটুকুই যেন তাকে কর্মময় জীবন-প্রবাহ থেকে বঞ্চিত করে' এখানে বন্দী করে' রেখেছে। কিন্তু তার মতো একজন শিক্ষিত যুবকের পক্ষে এ সব কি উচিত? সামান্য একটি মেয়ের মাধুরীর পাশে ভুলে' থেকে জীবনটাকে এভাবে অর্থশূন্য করে' দেওয়া কখনোই উচিত নয়। জননী আজ তার মৃতা। কেন? যেহেতু হু'বেলা পেট ভরে' খেতে পাননি; তার মতো উপযুক্ত ছেলে থাকতে জননী মারা গেলেন না খেয়ে! চেষ্টা করলে কি তার এতদিনে চাকুরী হ'ত না? কিন্তু সেও তেমন ভালো করে' আপ্রাণ হয়ে চেষ্টা করেনি। কি যেন একটা হুর্বলতা, কি যেন একটা নগ্ন মোহ তাকে বার বার বাধা দিয়েছে; মনে হ'ত বেণুকে পড়ানোই যেন তার জীবনের একটা মস্ত সার্থকতা। আজ জীবনের একটা মস্ত বড় অভিশাপ তাকে ঘিরে' রয়েছে; তাকে ঘিরে' রয়েছে যৌবনের সর্ব অর্থশূন্য মাধুরীর স্বপ্ন! সে স্বপ্ন তাকে করেছে পুরুষত্বহীন; শক্তিশালী পুরুষের কর্মপ্রবাহ থেকে তাকে করেছে বঞ্চিত। কিন্তু আর নয়। তাকে কর্মময়; কার্যকুশলী জীবনের অধিকারী হ'তেই হবে; তাকে চাকুরী করতেই হবে; তাকে পয়সা রোজগার করে' দশজনের একজন হ'তেই হবে। হু'টী বোন ও একটি ভাইকে খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রেখে' মানুষ করে' তুলতেই হবে। তবেই হবে সে মনুষ্য নামের যোগ্য। প্রকৃত শক্তিশালী পুরুষ

পুরুষত্বহীন জীবন বহন করে' বেঁচে থেকে আর লাভ কি? বেণুকে তার ভালো লাগে; কিন্তু সে ভালো লাগার কি কোন মানে আছে? কর্মহীন অলস দারিদ্র্যপীড়িত জীবনের কাছে প্রেমের, ভালবাসার কি কোন মূল্য আছে? প্রেম, ভালবাসা, প্রীতি, স্নেহ তখনই উজ্জ্বল মহাশক্তিশালী যখন জীবন সর্বৈশ্বর্যময়। বেণুকে ভালবাসার মূল্য তখনই হবে যখন সে অতুল ঐশ্বর্যের ও শক্তিময় জীবনের মালিক হয়ে হেসে দাঁড়িয়ে বেণুকে বলতে পারবে যে, সে দিগ্বিজয়ী পুরুষ, সকল বিশ্বের দৌলত, কর্মধারা তার ভিতরেই প্রবাহিত। তখনই তার ভালবাসার মূল্য হবে প্রচুর, তখনই সে জগৎসভায় সকলের কাছে মুক্তকণ্ঠে বলতে পারবে, ঐশ্বর্যময় ও প্রেমময় জীবনই ধরায় ধন্য।

অঞ্জন চলে' গেল রেংগুন, জীবনের ঐশ্বর্য কোথায় খুঁজে' বার করতে। যাবার দিন বেণু কাছে এসে দাঁড়ালো, নম্র নত সজল চোখে। অঞ্জনের পায়ের ধুলো নিয়ে বললে, শরীরের দিকে দৃষ্টি রাখবেন, স্বাস্থ্য ভালো থাকলেই জীবনে উন্নতি করা যায়। অঞ্জন শুধু বললে, চেষ্টা করবো।

অঞ্জনের ভাগ্যলক্ষ্মী হেসে' উঠলো। রেংগুন গিয়ে ন্যাশন্যাল ইন্ডিয়ান্ লাইফ অফিসের রেংগুন শাখায় অর্গ্যানাইজারের পদ পেলো। চার পাঁচ বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করায় বেশ মোটা টাকা রোজগার করলো। ব্যাংকে এ্যাকাউন্ট খুলে' দশ হাজার টাকা জমা দিলো। বোন দু'টাকে ম্যাট্রিক পাশ করিয়ে উপার্জনক্ষম উচ্চ শিক্ষিত সৎপাত্রের সাথে বিয়ে দিলে। জীবন হয়ে উঠলো সমৃদ্ধ ও সুশীল; উজ্জ্বল জীবন ছন্দ-মুখর বিপুল ভবিষ্যৎ আজ তার সম্মুখে। সহসা মনে পড়ে, বেণুর কথা। বেণুর বিয়ে হয়ে গেছে কি? দ্বিধায় ও সন্দেহে তার বুকের তলে জেগে উঠে ঘন দীর্ঘশ্বাস।

সহসা তার কানে আসে, রেংগুন গেজেট্। 'সিংগাপুরে বোমা-বরিষণ, হতাহত সামান্য।' কাগজওয়ালা ডেকে' সে কাগজ নিলে

ব্রিটিশ জাপান যুদ্ধ। সত্যই সিংগাপুরে বোমা পড়েছে, লোকক্ষয় সামান্য। কিন্তু সামান্য হোক বা অসামান্য হোক, রেংগুন থাকা এখন আর উচিত নয়। ক্রমাগত সাইরেন পড়ছে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ট্রেঞ্চে ঢুকে' কাটাতে হয়, লোক আহার-নিদ্রা, ব্যবসা-বাণিজ্য, ধন-দৌলত, টাকা-পয়সা, ঘর-বাড়ী সব বিষবৎ ত্যাগ করে' চারদিকে ছুটোছুটি করছে। চারদিকে ভেসে' উঠছে যুদ্ধ-পীড়িত অসহায় মানব-জীবনের কাতর ভয়-বিহ্বল মর্ম্মন্তুদ দৃশ্য।

বংগোপসাগর পাড়ি দেবার আজই শেষ জাহাজ। অঞ্জন এ জাহাজ ধরে' ক'ল্‌কাতার হেড অফিসে এসে' ম্যানেজারের সংগে দেখা কর্‌লে। ম্যানেজার বল্‌লে—আপনার অর্‌গ্যানাইজেশনে কোম্পানী বিশেষ উন্নত ও লাভবান, এখন ইচ্ছা কর্‌লে সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের পদ নিতে পারেন, মাইনে সাড়ে চার্‌শো টাকা। অঞ্জনের মুখে ফুটে' উঠলো ঐশ্বর্যের হাসি, বিনয়-নম্র বচনে সে সম্মতি জানালে।

নূতন পদে নিযুক্ত হওয়ার মাসখানেক পর অঞ্জন দু'মাসের ছুটী নিয়ে চলে' গেলো মধুপুর স্বাস্থ্য বদ্‌লাতে। রেংগুনে থাকা-কালীন অক্লান্ত পরিশ্রমে ও শেষে জাপানী বোমার বিভীষিকাময় অনুভূতিতে, অনাহারে, অনিদ্রায় শরীরটা একেবারে ভেংগে গেছে—বিশ্রামের দরকার। কি স্বাস্থ্য কি হয়ে গেছে! তার মনে পড়লো বেণু একদিন বলেছিলো—স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখবেন। আজ স্বাস্থ্যই বা কোথায় আর সেই বেণুই বা কোথায়! মস্ত বড় পরিবর্তনের ক্ষত-চিহ্ন আজ তার দেহে ও মনে।

একদিন বিকাল বেলা অঞ্জন বেড়াতে বেরিয়েছে, একটি ছোট্ট মেয়ে কাছে এসে বল্‌লে—আপনাকে দিদি ডাকছে। অঞ্জন বিস্মিত বিহ্বল চোখে মেয়েটীর দিকে চেয়ে বল্‌লে—কে তোমার দিদি?

এমন সময় বেণু নিজেই এসে বল্‌লে, মধুপুরে এসেছেন স্বাস্থ্য ফিরাতে, তা জানি, কোথায় আছেন তাও জানি। ভাবছিলাম, একদিন

গিয়ে প্রণাম জানিয়ে আসবো। আজ এ-পথে যেতে দেখলাম, তাই পাশের বাড়ীর ওই মেয়েটীকে দিয়ে ডেকে পাঠিয়েছি। আসুন ভিতরে, ঘরে এসে বসুন।

বেণুর বাবা আশুবাবু মৃত্যুশয্যায় শুয়ে—অঞ্জনকে দেখেই তিনি বললেন—এসো বাবা এসো, ভালো তো? বেণু সেদিন বলছিলো, তুমি মধুপুরে আছো, বসো বাবা ঐ চেয়ারটায়। বেণুর কথা তো কিছুই জানো না, সে এক মস্ত বড ট্র্যাজেডি! বলে' আশুবাবু কিছুক্ষণ চুপ করে' থেকে পরে গভীর দীর্ঘশ্বাস টেনে বললেন—বেণুর বিয়ে হয়েছে। এ কথা বলে'ই আশুবাবু আবার সহসা একটু থেমে' গিয়ে চীৎকার করে' উঠে বললেন—না না না, বেণুর বিয়ে হয়নি, অমন আস্ত মাতালের কাছে কে মেয়ের বিয়ে দেয়! সে যে মাতাল, সে যে গুণ্ডা, সে যে আমার বেণুর জীবনে মহা-মৃত্যুময় ব্যাধি! না, আমি চাই না তাকে, সে পালিয়েছে, তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি, সে মরে' গেছে, সে নেই! বলে' আশুবাবু ক্লান্ত ও রুদ্ধশ্বাস অবস্থায় আবার শুয়ে' পড়লেন। এমন সময় বেণু এক কাপ চা নিয়ে এসে অঞ্জনকে বললে—চাটুকু খেয়ে নিন, সন্ধ্যা হয়ে গেছে, আমি রান্না বসিয়েছি—খেয়ে যাবেন আজ এখান থেকে।

অঞ্জন বললে—চা তো আর খাই না, তুমিই তো মানা করেছিলে, মনে নেই?

বেণু হেসে বললে—বৌদি বুঝি সকাল বেলা আলু সিদ্ধ ভাত রান্না করে দেন?

অঞ্জন উঠে দাঁড়ায়। সিক্ত কণ্ঠে বলে, তেমন দরদী আজও কাকে খুঁজে' পাইনি!

সহসা বেণুর বুকটা হু হু করে' কেঁদে উঠে, হাত থেকে চায়ের কাপটা হঠাৎ শান-বাঁধানো মেঝের উপর ঠাস করে' পড়ে' যায়, ভেংগে হয় চূর্ণ-বিচূর্ণ। দু'টী ব্যর্থ হৃদয়ের ধ্বনি যেন বেজে উঠে সারা ঘরে।

প্রেমের অভিশাপ

সুদূর পাড়া-গাঁয়ে মাষ্টারী ; একটা বালিকা বিদ্যালয়ে। জন কুড়ি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে স্কুলগৃহটি রায়দের বাড়ীর এক পাশে দাঁড়ানো। এ ঘরখানার উপর নির্ভর করে'ই রেণুকা সেদিন তার নিজ দেশের ঘর ভেংগে এ গ্রামে এসে বাসা বাঁধলো শিক্ষয়িত্রীরূপে।

দশটা থেকে চারটে পর্যন্ত স্কুল: কিন্তু গ্রামের স্কুল, কোন কড়াকড়ি নিয়ম নাই, যখন খুসী স্কুল করলেই চলে। তা'ছাড়া ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, প্রায়ই স্কুলে আসতে চায় না। মেয়েদের মধ্যে যারা একটু বড়, তারাও রোজ সময়-মতো স্কুলে আসে না। ও বাড়ীর সুজলা প্রায়ই স্কুলে দেরী করে' আসে। সময়-মতো স্কুলে রওনা হ'তে চাইলেই মা রাগ করে' নানা কথা বলে। বলে—রেণুকা মাষ্টারণীকে এই মাত্র দেখে এলাম সাবান মেখে' দীঘির জলে নাইতে। এরপর রান্না করবে, খাবে, শেষে স্কুলে যাবে। আর মেয়ের আমার রাত ভোর না হ'তেই স্কুল সুরু হয়। লেখাপড়া শিখে কোন্ স্বর্গে যাবে শুনি? বিয়ে হয়ে গেলে এমনি পাড়াগাঁয়ে নিত্য অভাব-অনটনের ভিতর ঘর সংসার করতে হবে। চোখের সাম্‌নে রেণুকা মাষ্টারণী—কি ফল হ'লো তার এতো লেখাপড়া শিখে? মাত্র পঁচিশ টাকা মাইনে পায় ; যুদ্ধের বাজারে আধমণ চা'লের দামও নয়। চারটি সন্তান, বিধবা মা, বেকার স্বামী, নিজে। এতোগুলি লোকের এ পঁচিশ টাকায় কিছুই হয় না। কাজ নেই তোর স্কুলে গিয়ে। এদিকে ছোট ছেলেটার ক'দিন যাবত পেটের অসুখ, তার উপর ম্যালেরিয়া—বাঁচবে তো নাইই, তবু যত্ন চেষ্টা করা। সে সব কি তোকে দিয়ে হয় কিছু ; তোর কেবল রাত ভোর না হ'তেই স্কুল। ওকে আজ আর ভাত দিচ্ছি না, একটু সাগু জ্বাল দিয়ে দে। কপাল আমার! এ সাগুগুলি এখানে পড়লো কি করে'! সারা ঘরময় সাগু! এখন ছেলে খাবে কি? ছ' টাকা সের সাগু ; বাপের বয়সে যা শুনিনি কোনদিন ; এখন উপায়?

রাগে ও অভাব-অনটনের দুঃখে সুজলার গালে এক চড় দিয়ে বলে—বলি, তোমাকে কোন্ সময় বলেছি খোকাকে সাগু করে' দিতে! এখন এ সাগু এখানে ফেললে কে? তোমারই এ কাজ! সুজলার চুলে ধরে' শেষে ঘর থেকে বের করে' দিয়ে বলে—যাও, স্কুলে গিয়ে পণ্ডিত হয়ে এসো গিয়ে।

সারাদিন স্কুলের খাটুনির পর রেণুকা ঘরে ফিরে। স্কুল-ঘরে বন্দী হয়ে থাকতে থাকতে শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে পড়ানো যে জীবনে কত বড় অভিশাপ—জানে সে। এক পড়া পঞ্চাশ-বার পড়িয়ে দিলেও সে একই অবস্থা, কিছুই মনে থাকে না; মনে থাকে শুধু রাজ্যের যতো দুষ্টোমি আর শয়তানি। ঝগড়া-বিবাদ, মারামারি লেগেই আছে। বুঁচি এসে নালিশ করে—মাসিমা, বোঁচা আমাকে কিল মেরেছে; ভজা এসে কাঁদতে কাঁদতে বলে, রাধা মেয়েটা তাকে চিম্‌টি কেটেছে। একেবারে অসহ্য! স্কুল থেকে বেরুতে পার্‌লেই যেন মুক্তি। চারটের পর রেণুকা যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচে।

স্কুল থেকে বা'র হ'লেই সম্মুখে ঠাকুরবাড়ীর পুকুর পড়ে। পুকুর পাড়ে একটা বহু পুরাতন বকুল গাছ। বৈশাখ মাস, বকুল পাতাগুলি নবজন্ম লাভ করে' সতেজ সবুজ হয়ে ফুটে বেরিয়েছে। একবার গাছটার দিকে চেয়ে রেণুকার প্রাণ জুড়ায়। কী সুন্দর নতুন কচি জীবন্ত পাতাগুলি! নববর্ষের বিপুল আশীর্বাদ যেন ঝরে' পড়েছে প্রতি তৃণ-তরুলতার পাতায়! বকুল গাছটা থেকে সুরভিধারা ভেসে আসছে। সমীর সুগন্ধ; অরণ্য অধীর চঞ্চল। নবীনের জীবন্ত পরশ চারিদিকে ছড়ানো। পুরাতন দিন চলে' গেছে; চলে গেছে যেন পুরাতন ব্যথা। জীর্ণ শীর্ণ শুষ্ক তরুশাখা আজ আর নাই। সতেজ সবুজ শ্যামল পত্র, পুষ্প, প্রতি শাখায়, প্রতি বৃন্তে। সুগন্ধ কুসুম-পুলকিত প্রতিটি ভ্রমর আজ সঙ্গীতমুখর। অনন্ত আনন্দ, অনন্ত মাধুরী, অনন্ত জীবন, অনন্ত পরমায়ুঃ।

কিন্তু……। রেণুকার বুকে রুদ্ধ ব্যথা জাগে, নয়নকোণে নিবিড় হয়ে' উঠে তিক্ত অশ্রুজল। কি যেন বলতে চায়, বলতে পারে না! হাঁ, কিন্তু সে মরতে পারলেই যেন বাঁচে। এ বিশ্বপ্রকৃতির আনন্দ ও অভিনবত্বের মাঝে সেই-ই যেন শুধু চির পুরাতন, চির জীর্ণ শীর্ণ, ক্ষত বিক্ষত, বেদনা-ব্যথিত, বৈচিত্র্যহীন, একঘেয়ে দারিদ্র্য-পীড়িত জীবন বহন করে'। নববর্ষের নব-ঐশ্বর্য, নব প্রাণ, নব জীবন কি তার জন্য নয়?

সহসা বকুল গাছ থেকে' ডেকে' উঠে কালো পাখীটা—কুহু…কুহু…। রেণুকার সর্ব শরীর আজ কণ্টকিত হয়ে উঠে? কুহুতান মুখরিত প্রেমগান আজ তার সর্বাংগে ঢেলে দেয় বিষাক্ত পরশ। কুহু-সংগীতে আজ আর সেই মাদকতা নেই; আছে শুধু বক্ষভেদী অগ্নিবাণ।

তখন সে সবে মাত্র ম্যাট্রিক ক্লাশে উঠেছে, সুন্দর ষোলোটি বৎসর তার বয়স। সুন্দর দু'টি চোখের কোণে কত নবীন নিখিল স্বপ্ন; কত তরুণী কল্পনা তার তরুণ তপ্ত বুকে। কিছুদিন হ'ল এক রাজকুমার এসে বাসা বেঁধেছে তার হৃদয়ে। কুমারের প্রেম-সৌধ-চূড়ায় রেণুকার প্রাণ-প্রজাপতি পাখী হয়ে বার বার উড়ে বসে। এমনি গ্রামের এক প্রান্তে একটা বকুলগাছতলায় হ'ত তাদের মিলন। এমনি বৈশাখের শ্রান্ত বেলায় বিরহ কাতর দু'টী ক্লান্ত প্রাণ মিশতো এসে কুসুম-সুরভিত, পিক-বধূ-সংগীতমুখরিত বকুলতলায়। হ'ত দু'জনে কত কথা; কত ব্যথা ঝরে' পড়তো অশ্রু হয়ে।

অমিয়কুমার বলতো—রেণু, আমাদের এ অভিযান হবে গভীর ব্যথায় ভরা, হবে ব্যর্থ। আমার এমন কোন যোগ্যতা নাই তোমাকে পেতে পারি। নাই শিক্ষা, নাই চাকুরী, নাই অর্থ, এমন কি নাই আমার সুন্দর স্বাস্থ্য। বর্ত্তমান পৃথিবীতে বাস করার কোন কুশলতাই আমার নাই, আমাকে বিয়ে করলে তোমার হবে দুঃখ, হয়তো সুখী হ'তে পারবে না কোনদিন। রেণুকা হেসে বলতো—ভালোবাসা নিত্য ঐশ্বর্যময়, অনন্ত

আনন্দের। শিক্ষা-দীক্ষা, চাকুরী-বাকুরী, টাকা-পয়সা, ধন-দৌলত কত তুচ্ছ মনে হয় এ প্রেমের কাছে। তুমি সেজন্য ভেবো না; নিঃস্ব তোমার মাঝেই খুঁজে' পাবো রাজার রাজ-প্রাসাদ; স্বর্গের সুখ শান্তি। টাকা পয়সাতেই কি জীবনে সুখী হওয়া যায়? জীবনে সব থেকে বড় পাওয়া স্বামী স্ত্রীর মনের মিল। তুমি হবে আমার জীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার; মণি-মাণিক্য-খচিত কণ্ঠহার হবে তুচ্ছ তোমার ঐ দু'টী বাহু-কণ্ঠহারের কাছে। কিন্তু আজ? রেণুকার বক্ষ হ'তে নেমে আসে বৈশাখী ঝড়ের মতো শুধু ঘন দীর্ঘশ্বাস।

বৃদ্ধ পিতা, স্কুল মাষ্টার। মার কাছে একদিন এসে বললে—আমারই একটি পুরাতন ছাত্র কাগজের ব্যবসায় যথেষ্ট টাকা উপায় করে' ক'লকাতায় একখানা বাড়ী করেছে। বি. এ. পাশ। স্বাধীনচেতা, চাকুরী না করে' ব্যবসা করে' বেশ উন্নতি করেছে। এ ছেলের সংগেই রেণুর বিয়ে ঠিক করেছি, এক কথায় সম্বন্ধ হয়ে গেছে, হবে না কেন? আমাদের রেণুর মতো মেয়ে ক'টী মিলে বাংলাদেশে। যেমনি নাক মুখ, তেমনি চোখ; ঠোঁট্ দুটো কোমল, সুন্দর পাতলা; জবাফুলের পাঁপড়ির মতো রাঙা আভায় ভরা; আর স্নানের পর চুলগুলি পিঠের উপর ছেড়ে দিয়ে যখন মেয়ে আমার রৌদ্রে গিয়ে বসে, মনে হয় আষাঢ়ের কালো মেঘ ওর পিঠে এসে জমেছে। ফিগারটাও বেশ লম্বা, আধুনিক ছেলেরা এখন লম্বা ফিগারই পছন্দ করে; কাজেই এক কথায় সম্বন্ধ হয়ে গেছে। তোমার কোন আপত্তি নাই তো?

আপত্তি কারোরই নাই। শুধু তার প্রেমিক মন; প্রণয়-ব্যথাতুর প্রাণ, সেদিন সে পিতামাতার আপত্তিহীন মনের কাছে মাথা তুলে' দাঁড়িয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে। কিছুতেই সে এ ছেলেকে বিয়ে করবে না।

ব্যর্থ হ'লো স্নেহাতুর অভিজ্ঞ পিতামাতা; সন্তান-বাৎসল্যে ভরে'-উঠা তাদের মমতাময় প্রাণ। মেয়ের অশ্রুসিক্ত মুখের দিকে চেয়ে তারা

ভুলে' গেলো ব্যবসাদার অর্থশালী বরের কথা ; তাদের জীবনের স্বপ্নময় কল্পনা প্রেম-অভিজ্ঞতার কাছে হ'লো ব্যর্থ।

তারপর কেটে গেছে দশ বৎসর। ম্যাট্রিক পাশের সাথে সাথেই বিয়ে হ'লো তার সেই বকুলতলার প্রিয় অমিয়কুমারের সাথে। বিয়ের বছরখানেক পর মারা গেল, ব্যথিত পিতা। বেকার আই. এ. ফেল স্বামীকে নিয়ে কিছুদিন দেশের বাড়ীতে ঘর-সংসার করলে। চার বছরে চারিটি সন্তানের জননী হ'ল ; সংসারের খরচ বাড়লো চারগুণ কিন্তু আয়ের ঘরে নাই জমা একটি পয়সা। ক'দিন আর বসে' খাওয়া চলে ? স্বামী অমিয়কুমারের কোন চাকুরী হ'লো না। চাকুরী হওয়ার মতোও তার কোন কার্য্যকুশলতা নাই। ভবঘুরে, ছিন্নমতি চঞ্চল যুবক। রেণুকার চোখে এলো জল। স্বামী দেবতা, কিছু বলাও যায় না অথচ এ দারিদ্র্য সহ্য করাও যায় না। ছেলেপুলের মুখের দিকে চাইলে কান্না আসে। শুষ্ক দীন মুখ, হাড় বেরিয়ে পড়া স্বাস্থ্য, ছিন্ন মলিন বেশ। এ দরিদ্র ঘরে এ শিশুগুলির জন্ম না হ'লেই ভালো হ'ত। না, এখন আর বসে' থাকা চলে না। সে নিজেও দু'পয়সা রোজগার করতে পারে। ম্যাট্রিক পাশ সে ; কোন বালিকা বিদ্যালয়ে মাষ্টারী করে' ত্রিশ, চল্লিশ টাকা অনায়াসে উপার্জন করতে পারে। চলে এলো রেণুকা তার দেশের বাসা ভেংগে সুদূর গ্রামে চাকুরী নিয়ে। কিন্তু মাহিনা মিললো মাত্র পঁচিশ টাকা। স্বামী স্ত্রী, চারটি সন্তান, আর মা—এ ক'জনের পঁচিশ টাকায় কি করে' চলে ? চাল একমণ পঁচিশ টাকা, শাড়ী একখানা আট টাকা। যুদ্ধ কি শুধু ব্রিটিশ জাপানে ? বিশ্বের প্রতি ঘরে আজ যুদ্ধ। বেঁচে থাকার জন্য আজ প্রতি গৃহে জীবন-সংগ্রাম। মহাযুদ্ধ পৃথিবী ব্যাপী ; খণ্ডযুদ্ধ, খণ্ডপ্রলয় আজ ঘরে ঘরে। কিন্তু এমন দুর্দিনে প্রত্যেক গৃহেই মেয়েদের আশ্রয়, মেয়েদের আশা ভরসা, পুরুষের উপার্জনশীল প্রশস্ত বক্ষস্থল। রেণুকার দু'টী চোখ বাঁধনহীন ব্যথাভারাতুর

অশ্রুধারায় ভরে' উঠে। সে আজ কত আশ্রয়হীন! অকূল সমুদ্রে ঝড়ের রাতে ভাসমান দিশাহারা একখানি তরণী যেন তার চোখের সমুখে ভেসে' উঠে।

রেণুকা ঘরে এসে তাড়াতাড়ি একটু চা খেয়ে আবার একটি মেয়েকে গান শিখাতে বের হয়। মাত্র তিন টাকা মাইনে, সপ্তাহে তিনদিন। পাড়াগাঁয়ের মেয়ে লেখাপড়াই শিখে না, গান তো দূরের কথা—তবু বলে' কয়ে' বিশেষ অনুরোধ করে' এ তিন টাকার চাকুরিটী সংগ্রহ করে' নিয়েছে। কিন্তু ছাই গান; মেয়েটার নাই সুর, নাই তাল। কেবল হারমোনিয়ামটা নিয়ে একটু পোঁ পোঁ শব্দ করা।

ঘণ্টাখানেক পর সন্ধ্যার একটু আগে রেণুকা আবার ঘরে ফিরে। দীঘির পাড়ে ঐ আমবাগানের ভিতর দিয়ে ছায়াঘন নিবিড় নির্জন পথ। রেণুকার মনের ছায়া ঘন আঁধার যেন এখানে এসে কেঁদে উঠে। রেণুকা আপন মনে গাইতে থাকে:

দুঃখের বেলা ওই বয়ে যায়,
দুখের নিশি সমুখে ঘনায়।
জীবন ভরা আঁধার ছায়া
মিছেরে আজ গৃহের মায়া,
কে জানে এই জীবনধারা
মিশবে সাহারায়।

রেণুকার প্রাণস্পর্শী সংগীত-সুরে কেঁপে ওঠে সারা আম্রবন, কাঁপে দীঘির কালো জল, কাঁপে কলসী কাঁখে দীঘির ঘাটে দাঁড়ানো গ্রাম্য-বধূর বুক। শেষে সন্ধ্যার আঁধার কূলে মিশে যায় আঁধার তপ্ত রেণুকার সংগীত সুর।

ঘরে ফিরে' রেণুকা প্রাণ হ'তে প্রিয়, মায়াময়, শাড়ীখানা ব্যাকুল অন্তরে ছেড়ে' যত্ন-সহকারে রেখে দেয়, ভাল কাপড় মাত্র এখানাই; সারাক্ষণ পরা চলে না। ছেঁড়া আর একখানা বহু পুরাতন কাপড় পরে'

আবার রান্না ঘরে ঢোকে। মা বৃদ্ধা, রান্না তাকেই করতে হয়। রান্না শেষ করে' আগে ছেলেপুলেদের খেতে দেয়। কিন্তু আজকাল ছেলে-মেয়েগুলি এত রাক্ষুসে হয়েছে যে, কেবল বার বার খেতেই চায়। সম্পূর্ণ পেট না ভরা পর্যন্ত কিছুতেই উঠবে না। আজ রেণুকা শেষে বড় ছেলেটার গালে একটা চড় মেরে বললে, রাক্ষস হয়েছিস্! আঠাশ টাকায় পেট ভরে' খাওয়া চলে না, সে জ্ঞানটুকু তোমার এতদিনেও হ'লো না? অবোধ শিশু কিছুই বুঝতে পারে না; শুধু মার মুখের দিকে চেয়ে কেঁদে কেঁদে বলে, মা পেট ভরেনি।

রেণুকার বক্ষ কি যেন দারুণ আঘাতে বিদীর্ণ হয়ে যায়; রক্তাক্ত হয়ে উঠে তার সকল তনু মন; বেদনায় ভেংগে যায় তার মর্মস্থল। চোখের কোণে ভেসে উঠে নিপীড়িত মাতৃস্নেহের বেদনা-ধারা। ভেসে উঠে চোখের সম্মুখে তার পিতার সেই ছাত্রটীর কথা। হয়তো আজ সে লক্ষপতির স্ত্রী হয়ে এ অবোধ ক্ষুধার্ত শিশুগুলির মুখে তুলে' দিতে পারতো দুগ্ধ-অন্ন; গড়ে' তুলতে পারতো রাজপুত্র করে'। কিন্তু তার সেই যৌবন দিনের অন্ধ প্রেম, দীন ভালবাসা করেছিল তাকে মুগ্ধ। সেই অনভিজ্ঞ বিষাক্ত প্রেম আজ দুর্ভিক্ষপীড়িত চারটি সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করে' তাকে কাঁদাচ্ছে বারোমাস। পিতামাতার অভিজ্ঞতাকে সে সেদিন করেছিলো অবহেলা, দলিত মথিত, কিন্তু আজ সে নিজেই হয়ে গেছে চিরজীবনের তরে দারিদ্র্যের চরণতলে ক্ষতবিক্ষত। প্রেমের অভিশাপে আজ সে দলিত মথিত। অনভিজ্ঞ সেদিনের প্রেম আজ তার গৃহে চিরক্ষুধার্ত। চির অশ্রুময়।

ক্ষুধার্ত ছেলেটিকে রেণুকা শেষে কোলে তুলে' অশ্রুসিক্ত চুম্বন ছেলেটীর অশ্রুসিক্ত নয়নতলে ঢেলে দিয়ে বলে, লক্ষ্মী ছেলে, আজ যাও, কাল পেট ভরে' খেতে দেবো।

ক্ষুধার্ত

ভিখারী। কিন্তু এরাও আমার মতো মানুষ, একটু দাঁড়িয়ে দেখতে আপত্তি কি? দেখি ওরা কি করছে। ভয়ানক দুঃখ হয় ওদের দিকে চাইলে। রাস্তার উপর কি ভাবে পড়ে' আছে। সামনেই আবার ডাষ্টবিনটা। কি বিশ্রী গন্ধ! বলে' প্রায় ঘণ্টাখানেক সিটী কলেজের সামনে রাস্তার ফুটপাথে দাঁড়িয়ে রইলাম। পায়ের তলে একবার ভালো করে' চেয়ে দেখলাম, কোন ময়লা নাই তো? পচা-গলা কোন ইঁদুর, কোন বিড়ালের বাচ্চা অথবা কাদা; কারণ কিছুক্ষণ আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে, রাস্তার মাঝে মাঝে কাদা ও জল জমে' রয়েছে। নতুন পাম্‌সু জোড়া সেদিন কিনেছি, বেশ মায়া আছে জুতো জোড়ার জন্য। কিন্তু রাস্তার এ জল-কাদা ও ডাষ্টবিন্‌টার কাছে ময়লা পচার উপর যে মানুষগুলি শুয়ে আছে, তাদের জন্য আমার সে মায়া নাই; থাকলে নিজের পায়ের তলে না চাওয়াই উচিত ছিল। নিজের মনুষ্যত্বকে সন্দেহ করলাম। কিন্তু ভেবে দেখলাম, আমি বর্তমান সভ্যসমাজের শিক্ষিত মানুষ, মনুষ্যত্ব না থাকলেও আজকাল চলে।

আমার ঠিক সামনেই কয়েকটি ভিখারী। ঠিক ভিখারী বলা চলে না; দেখে মনে হয় মধ্যবিত্ত ঘরের লোক, খেতে না পেয়ে এখন ভিখারীর বেশে পথে বেরিয়েছে। ওদের কিছু দূরে আরো অনেকগুলি ভিখারী, বৃহৎ ভিখারীর সংসার যেন। রাস্তার উপর গায়ে গায়ে লেগে পড়ে রয়েছে। তাদের কথা ছেড়েই দিলাম। আমার ঠিক সামনের লোক ক'টির কথাই বলছি। মনে হ'লো: স্বামী, স্ত্রী, একটি ছোট ছেলে, আর বারো তেরো বছরের একটি মেয়ে। মেয়েটিকে উলংগ বলা চলে, সামান্য ছেঁড়া ন্যাকড়া কোমরে জড়ানো মাত্র। পঁচিশ টাকা দামের শাড়ীপরা নিজের বিলাসিনী বোনটির দিকে মনে মনে একবার তাকালাম

সমস্ত অংগ শিউরে' উঠলো। চোখের সামনের ঐ মেয়েটী যদি আমার বোন হ'ত, তবে? সহসা মুখে হাসি ফুটে বের হ'লো, এ মেয়েটি ভিখারিণী, আমার বোন নয়। ও-সব বাজে কথা চিন্তা করি কেন? আমি শিক্ষিত ভদ্রলোক, সংগে সংগে বোনের আর একখানা শাড়ী আরও একটু বেশী দামে কিনে দেবার কথা ভাবলাম।

ছেলেটি শুয়ে আছে না মরে' গেছে ঠিক বুঝা যায় না, শায়িত জীবিত দেহের চেয়ে শায়িত মৃতদেহের ভাব-লক্ষণই বেশী। স্বামী স্ত্রী পাশাপাশি বসে'। মেয়েটি একটা ভাংগা বাসন হাতে করে' দাঁড়িয়ে। একটু দূরেই সরে' দাঁড়িয়ে আছি। যদি পয়সা চেয়ে বসে। মেয়েটি বার বার আমার দিকে চাইছে। কিন্তু সামনে এসে কিছু সাহায্য চাইতে সাহস পাচ্ছে না যেন। কারণ আমার সর্বাংগে ভদ্র-বিলাসী মানুষের আভিজাত্য। মেয়েটি যেন জানে—এ শ্রেণীর লোকগুলির কাছে সাহায্য চাইলে ধমক খেতে হয়। প্রাণটা আমার সত্যই কেঁদে উঠলো। কী মলিন কাতর মৃত্যুময় ভীরু চেহারা। ছায়া, না কায়া ঠিক যেন বুঝা যাচ্ছে না, মানুষ না মানব-কংকাল—বুঝা শক্ত। না খেয়ে খেয়ে ক্ষয়িষ্ণু চেহারায় এসে দাঁড়িয়েছে; যে চেহারায় মানুষকে মানুষ বলতে ভ্রম হয়। সেই শত ছিন্ন ধূলি-লুণ্ঠিত দলিত পীড়িত চেহারা। সন্দেহ হ'লো—সত্যই কি এরা মানুষ?

মেয়েটি ঠিক আমার সামনে সোজা এসে দাঁড়ালো, মুখোমুখি। অসহ্য ক্ষুধায় হাতের শুকনো থালাটা বার বার চাটছে; থালায় খাদ্যবস্তু কিছুই নাই; শূন্য থালায় শুধু ক্ষুধার্ত দীর্ঘশ্বাস, চোখের সামনে বাংলার জীবন্ত চিতা যেন দাউ দাউ করে' জলছে।

আমার মুখে দু' পয়সা দামের একটা সিগারেট্ জল্‌ছে, আকাশে ধোঁয়া উড়ে' যাচ্ছে। আমার শিক্ষাকে উপহাস করে' যেন মেয়েটি কাছে এসে' বললে, সিগারেট খাবো। বললাম, সিগারেটে কি পেট ভরে?

বললে—আপনি খান কেন? পেট ভরে' খাবার পর তাড়াতাড়ি হজম হবার সৌখিনতা, তুমি খাবে কেন? তোমার পেটে নেই ভাত; লজ্জা ঢাকবার মত কাপড়; নগ্ন বক্ষস্থল। ক্ষুধার্ত মুখের উপর হতে নামিয়ে এনে বস্ত্র-কাংগাল নগ্ন বক্ষ দু'টি থালাটি দিয়ে সহসা ঢেকে দিল। একটা তীব্র যাতনায় মেয়েটির সর্ব অংগ যেন কাঁপতে লাগলো। দু'টি চোখে বিষাক্ত কান্নার সুর; নীরব নিস্তব্ধ, অশ্রুবিহীন, শুকিয়ে গেছে ওর সমস্ত অংগ পৃথিবীর সমস্ত রসধারা হ'তে। পাষাণ চোখ, পাষাণ বুক, পাষাণ ওর পদতল। সহসা শান-বাঁধানো পথের উপর থালাটা ছুঁড়ে ফেলে দিলো; থালাটা ভেংগে টুকরো টুকরো হয়ে গেলো। সংগে সংগে আমিও ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেলাম। টুকরো টুকরো হয়ে গেলো আমার শিক্ষা, দীক্ষা, সভ্যতা, ভদ্রতা। সম্মুখের সিটী কলেজটাও যেন আমূল কেঁপে উঠলো।

মেয়েটী শেষে তার মার কাছে ঝাঁপিয়ে পড়ে' চীৎকার করে' বললো—মাগো, মা···মা!

সেই ক্ষুধার্ত "মাগো, মা" কান্নার সুর যেন সারা বাংলায় ঘুরে' বেড়াতে লাগলো। অসীম বেদনাভরা ক্ষুধাক্লিষ্ট মুখে মেয়েটীর মা আমার দিকে নীরবে চেয়ে কি যেন সাহায্য প্রার্থনা করলো; কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বললো না, বলবার প্রয়োজনও হয় না। ঐ বিরাট বেদনাভরা মুখ যার দিকেই তুলে' ধরুক সেই বুঝতে পারবে—সে কি চায়।

আগেই ঠিক করে' রেখেছি এক পয়সা দিয়েও সাহায্য করবো না; কারণ কোন ভদ্র শিক্ষিত লোকই সাহায্য করে না, কাজেই অমানুষের মতো চুপ করে' দাঁড়িয়েই রইলাম।

ব্যর্থ হ'লো সে। এমনি সে ব্যর্থ হয়েছে লক্ষবার। লক্ষ মানুষ তার পাশ কেটে চলে' গেছে। দেখে গেছে তার ক্ষুধিত নগ্ন মুমূর্ষু জীবন-প্রদীপ দিন দিন নির্বাপিত হ'তে! কিন্তু সে দেখা শুধু চোখের দেখা—

মানুষের সমাজের অসীম দৃষ্টি নিয়ে বাংলার দুর্ভিক্ষপীড়িত লোককে কেউ দেখে না। আমিও দেখলাম না। লোকটা বসে' ছিলো, এবার উঠে দাঁড়ালো। দাঁড়াতেও পারে না; কাঁপতে কাঁপতে পড়ে' যায় যেন। একটা শত ছিন্ন কাঁথার ভিতর থেকে একটা মাটির হাঁড়ি বা'র করে' নিলো। সাম্‌নের ডাষ্টবিন্‌টার উপর ঝু'কে পড়ে' খাদ্য অনুসন্ধান করতে লাগলো! কিছুই পেলো না। একটা মরা ইঁদুর বা'র বার নেড়েচেড়ে শেষে রাস্তার উপর ছুঁড়ে ফেলে দিলো। চারিদিকের অন্যান্য ভিখারীরা ছুটে' এসে ইঁদুরটা নিয়ে টানাটানি কর্‌লো; ইঁদুরটা ছিঁড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে গেলো। কেঁপে উঠলো আমার পায়ের তলে সমস্ত সভ্য জগৎটা। কেঁপে উঠলো সামনের প্রশস্ত রাস্তাটা। জীবন্ত জীবনের উন্মত্ত কোলাহল। উচ্চ শিক্ষিত আধুনিক তরুণ তরুণী। অসীম হৃদয়-বন্যা ঢেলে' পথ চলেছে। লক্ষ প্রাণের সুর যেন দু'জনারই বক্ষ হ'তে ছুটে পড়ছে। তরুণী বলছে, আজ দেশের এ দারুণ দুর্দ্দিনে প্রকাশ্য দিবালোকে পথের উপর দু'জনে মিলে প্রেমচর্চা না করে' দেশের চিন্তা করাই অধিক প্রয়োজন। তরুণ ভদ্রলোকটী তরুণীর সম্মুখে এসে পথরোধ করে' দাঁড়িয়ে বল্‌লো—কেন মানব-প্রেমের ভিতর দিয়েই দেশপ্রেমের পথ খুঁজে নিতে হয়।

—বাবু, দয়া করে' একটা পয়সা দেবেন? আজ ক'দিন ধরে' না খেয়ে আছি। বলে' মেয়েটীর মা তার হাতের হাঁড়িটা তরুণ তরুণীর সামনে তুলে' ধরলো।

—ভিখিরীদের জ্বালায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে দু'মিনিট কথা বলা যায় না। এই রিক্‌সা! ইধার আও। রিক্‌সাওয়ালা কাছে এলে দু'জনেই উঠে বসলো। তরুণীর নগ্ন কাঁধের উপর তরুণের বাম হাত লতিয়ে রইলো। বল্‌লো, চিত্রা সিনেমা মে চলো।

ওদের উচ্ছৃঙ্খল প্রেমের লম্বা বক্তৃতা শুনে' চিত্তটা জ্বলে' উঠলো। কেঁপে উঠলো যেন ভিখারিণীর হাতের শূন্য হাঁড়িটা। হাঁড়িটা থর

থর করে' কেঁপে কংকাল হাতখানি থেকে' পড়ে' যেতে চায় যেন। অসহ্য বেদনায় এবার নিজেই ভেংগে পড়লাম। পকেট থেকে একটা দু'আনি-তুলে' এনে হাঁড়ির মধ্যে ফেলে দিলাম। সমস্ত অংগ-ধ্বংসী দারুণ ক্ষুধার কাছে এ দু'আনিটা যে কত তুচ্ছ, তা নিজে ভেবেও লজ্জিত হ'লাম। কিন্তু ভিখারিণীর মা এ দু'আনিটার দিকে চেয়ে রইলো অসীম রাজ-ভাণ্ডারের দিকে চেয়ে থাকার মত চোখে। ওদের কাছে আজ একটা দু'আনির মূল্য সমস্ত ভারত-সাম্রাজ্যের সমান। বাংলার আকাশ-ভরা বোমারু বিমানও আজ এ দু'আনির কাছে তুচ্ছ।

শীর্ণ অবশ অংগুলি ক'টি দিয়ে মেয়েটির মা ঐ দু'আনিটি সজোরে চেপে ধরলো। আকুল সাগ্রহে তুলে' ধরে' বার বার বুভুক্ষিত চোখে দেখতে লাগলো! সত্য! না স্বপ্ন! বিপুল বিস্ময় তার চোখের তলে।

এমন সময় মেয়েটি মার হাত থেকে দু'আনিটি বাজ-পক্ষীর মত ছোঁ মেরে' তুলে' নিয়ে ছুটে চললো। মা স্তব্ধনেত্রে সেদিকে চেয়ে রইলো। পাশে ফুটপাতের উপর ছেঁড়া একখানা গামছা পরে' বসা মেয়েটির বাপ চীৎকার করে' বলে' উঠলো—পাজী মেয়েটা ক্ষিদের জ্বালায় আরও পাজি হয়েছে। দু'আনিটা নিয়ে পালালো বুঝি! ওর একা খেলেই চলবে? এদিকে আসুক না একবার, মেরে খুন করে ছাড়বো না ওকে…। সম্মুখে একটা ছোট গলি, বিয়ে বাড়ীর শানাই বাজছে। সেদিকে মেয়েটির মা ছায়ার মত কায়া বহন করে' এগিয়ে গেলো। তার দু'টি পাণ্ডু চোখের সামনে যেন জ্বলছে জগৎ-শ্মশান; লাল, নীল, কালো-বহ্নি ভরা সেই শ্মশান। প্রায় ঘণ্টাখানেক পর বিয়ে বাড়ীর বাঁশীর আর্তনাদ শুনে' কাংগালিনী মা ধনীর দুয়ার থেকে ফিরে এলো। হাঁ আর্তনাদই বটে! দুর্ভিক্ষপীড়িত বাংলার বুকে ধনীর আমোদ-আহ্লাদ, বিবাহ-উৎসব—আর্তনাদের মতই মনে হয়।

ভিখারিণী মা ফিরে এলো, হাতে একটি কচ্ছপের বুকের হাড়। বিয়ে বাড়ীর দরজার সম্মুখে রাস্তার উপর থেকে কুড়িয়ে এনেছে। হাড়টা থেকে তাজা রক্ত পড়ছে, সদ্য কাটা। ক্ষুধাতুর বুকের রক্ত-রাঙা ছবি যেন কাংগালিনীর হাতে।

স্বামীর পাশে বসে' বললো—রক্ত পেয়েছি! খাবে? বিয়ে বাড়ীর পাশে কুড়িয়ে পেয়েছি, মাংস তাদের; রক্ত আমাদের। তীক্ষ্ণ অট্টহাসি হেসে' বল্‌লে—খাও, খেতে হবে, বাঁচতে হবে!

এমন সময় মেয়েটি হাতে করে' খানকয়েক টুকরো রুটী নিয়ে এসে বল্‌লো—দু' আনার রুটী এনেছি।

—কি বললে! রুটী!

মা ঠিক তেমনি মেয়ের হাত থেকে রুটীর টুকরো বাজ পাখীর মত ছোঁ মেরে' তুলে' নিয়ে কচ্ছপের বুকের রক্তাক্ত হাড়টার উপর রাখলো, শেষে মা, মেয়ে ও বাপ তিনজনে একত্রে বসে খেতে আরম্ভ কর্‌লে। কচ্ছপের রক্তে রুটী ভিজিয়ে খেতে লাগলো; কাঁচা কচ্ছপের হাড়, কাঁচা রক্ত, কাঁচা রুটী। পার্শ্বে শায়িত ছেলেটাকে মা ডাকলো—খোকা খাবি? আয়।

কাঁথার নীচে ছেলেটি। কোন সাড়া শব্দ নেই, মা রক্তে মাখা একটু রুটী নিয়ে কাঁথা তুলে' খোকার মুখে দিতে গিয়ে দেখে খোকা নেই। পিতা মায়ের হাতের রুটির টুকরো কেড়ে নিয়ে নিজের মুখে ফেলে দিয়ে পাষাণ হাসি হেসে বললো—মরে নি, বেঁচেছে।

এমন সময় কোথা থেকে একটা ক্ষুধার্ত কুকুর এসে ঠিক তেমনি কচ্ছপের হাড়খানা বাজপাখীর মত ছোঁ মেরে জোড়ে কামড় দিয়ে তুলে' দৌড়িয়ে রাস্তার ওপাশে চলে গেলো। মেয়েটি কুকুরটার দিকে কতক্ষণ চুপ করে' চেয়ে থেকে কেঁদে কেঁদে বললো—হাড়খানায় আরো অনেক রক্ত ছিলো। পিতা গভীর বিষাদ চোখে কুকুরটার দিকে চেয়ে বললো—ক্ষুধার্ত।

পল্লী-প্রান্তে

ম্যাট্রিক পাশ ক'রেই দেবপ্রসাদ চাকুরীতে ঢোকে—ক'লকাতা শহরের একটা ব্যাংকে। পাঁচ বছর কেটে গেছে অবিশ্রান্ত অফিসের খাটুনিতে। আজ এক মাসের ছুটী পেয়ে দেবপ্রসাদ বাড়ী রওনা হ'লো। সুদূর পাড়াগাঁয়ে বাড়ী। গাড়ী থেকে নেমেই লঞ্চে উঠলো। ছোট নদী। বর্ষাকাল, শ্রাবণ মাস। জল-যৌবনে নদীবক্ষ টলমল। লঞ্চ চলছে—লঞ্চটার সর্বাংগ শুভ্র, সুগভীর নীল জলের স্রোতে যেন শ্বেতপক্ষ রাজহংস।

নদীর দু'ধারে বহুদূর পর্যন্ত বিল। শ্রাবণের বরষা-প্লাবিত, চারিদিক ঘিরে কূলহীন অনন্ত সমুদ্র যেন। দেবপ্রসাদের মনে আজ কত কথা ফুল হয়ে ফুটে উঠছে। চারিদিক থেকে ছুটে আসছে যেন শ্যামল স্নিগ্ধ বরষা-সিক্ত পল্লী-পরশ। শহরের এ পাঁচ বছরের কারারুদ্ধ জীবনের পর আজ এ উন্মুক্ত সুনীল আকাশ, এ টলমল ছোট নদীর জল, আর দু'পাশে নীল সাগরের মতো দিগন্ত ব্যাপী এ ভরা বিল—সকলই আজ দেবপ্রসাদকে ছুটীর নিমন্ত্রণ জানাচ্ছে। কিন্তু নদীটা আজ যেন অনেক দীর্ঘ হয়ে গেছে; পথ ফুরোয় না যেন; অবিরল লঞ্চের গতি; তবু মনে হয়, কতদূর?

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। শ্রাবণ সন্ধ্যা, গভীর ঘন অন্ধকার। লঞ্চটা আরো একটু এগিয়ে এসে নদীর এ মোড়টা ছাড়াতেই সামনে স্পষ্ট দেখা গেলো—নদীর জলের উপর কতগুলি বাতি জ্বলছে, জোনাকীর মতো। দেখতে দেখতে লঞ্চটা ঐ বাতিগুলির মাঝে এসে ঢুকলো; আস্তে আস্তে থেমে গেলো। এখানেই লঞ্চের ষ্টেশন। কারণ বর্ষাকালে এ মধ্যনদীর জলের উপরই ষ্টেশন বসে। নদীর তীরে আসল ষ্টেশন এখন জলের নীচে। চারিপাশে এ ছড়িয়ে-পড়া বাতিগুলি নৌকার

বাতি। প্রত্যেক প্যাসেঞ্জারের জন্য নিজ নিজ বাড়ী থেকে নৌকা নিয়ে চাকর এসেছে হ্যারিকেন বা লণ্ঠনের বাতি জেলে। যাদের চাকর নেই তাদের এসেছে হয়তো ছোট ভাই বা আর কেউ।

প্যাসেঞ্জাররা লঞ্চ থেকে ডাকাডাকি সুরু করছিলো—অঃ মনা, অঃ গদা! অঃ টেপা! ল্যাংড়া! প্রত্যেক নৌকো থেকে সাড়া এলো—এই যে এসেছি। নদীর জলের উপর ছোটখাটো একটা হাট বসলো যেন, এত কলরব! আস্তে আস্তে সব প্যাসেঞ্জার যে যার নৌকোয় নেমে চলে' গেলো, ক্ষান্ত হ'লো সব কোলাহল। দেবপ্রসাদ ভারী বিপদে পড়লো ; নকড়িকে চিঠি লিখলে সে নিশ্চয়ই নৌকো নিয়ে আসতো, কিন্তু এখন উপায়? ভাড়া দিয়ে নৌকো পাওয়া যায় না! দেবপ্রসাদ নৌকোর মাঝির অনুসন্ধান করলো। শেষে মিললো একটা নৌকো। মাঝি বলল—কোথায় যাবেন বাবু?

দেবপ্রসাদ বল্‌লে—এই কাছেই আমাদের বাড়ী, এখান থেকে মাত্র পণেরো মিনিটের পথ।

—দু' টাকা দেবেন।

—দু' টাকা! বলো কি?

—আজ্ঞে কত্তা, একসের চালের দাম মাত্তর।

তেরশ' পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষ তখন, বাংলা দেশ শ্মশান। দেবপ্রসাদ আর কিছু না বলে' নৌকোয় উঠে বসলো। মাঝি নৌকো বেয়ে' চল্‌লো। নদী ছেড়ে' নৌকো এসে ঢুকলো একটা খালের ভিতরে। গভীর ঘন অন্ধকার ; নৌকোর দু'ধারের কালো জলস্রোতের মতো অন্ধকার স্রোত চারিদিকে। আশে-পাশে অনেক গৃহস্থ বাড়ী। ছেলেপুলের কান্না শোনা যায় ; কিন্তু বাড়ীগুলি গভীর অন্ধকারে ঢাকা। সন্ধ্যাপ্রদীপের শিখা নাই কেন? দেবপ্রসাদ মাঝিকে বল্‌লে, গ্রামের বাড়ী-ঘরে আজকাল সাঁঝের বাতি কেউ জ্বালে না—?

—বাবু, শহরে থাকেন, পাড়াগাঁয়ের খবর আপনারা কি রাখেন? ছনিয়া আজ আঁধারে ঢেকেছে; কেরোসিনের অভাবে ঘরে কারো বাতি জলেনা; চালের অভাবে কারো পেটে নেই ভাত। পেটে অন্ধকার, চোখে অন্ধকার; ছনিয়াময় অন্ধকার। আলো দেখবেন কোত্থেকে?

খালের ছ'পাশে জলমগ্ন ঘন বেতসের বন; মাঝে মাঝে হিজল ও মাদারের বৃক্ষসারি। হিজল মাদারের হুয়ে'-পড়া ডালপালা আর বেতসের পাতাগুলি খালের উপর এসে ঝুঁকে পড়েছে; খালের উপর ভয়ানক জংগল জমে' উঠেছে; দেবপ্রসাদ মাঝিকে জিজ্ঞাসা করলো—রাস্তা এত অপরিষ্কার কেন? এত বন-জংগল কি করে' হ'লো। মাঝি বললে—এবার কি দেশে লোক আছে, ছভিক্ষে লোক গেছে মরে'; যারা ছিল তারাও ম্যালেরিয়ার ভয়ে পালিয়েছে শহরে। দেশে দিনের বেলা শেয়াল ডাকে; বাবু, যুদ্ধু দেশে ঘুঘু চড়িয়ে ছেড়েছে। মানুষ গেলো সব না খেয়ে মরে, তবু যুদ্ধু থাম্‌লোনা।

দেবপ্রসাদ নীরবে দীর্ঘ নিশ্বাস টান্‌লো। আর একটু এগিয়ে একটা পতিত ভূমি। এ জায়গাটা অনেক উঁচু, জলে ডুবে যায় নি; ঠিক খালের তীর ঘেঁষে। দেবপ্রসাদ সেদিকে চাইলো, এই জায়গাটা আবার একটু অস্বাভাবিক উঁচু। দেবপ্রসাদ বুঝতে পারলো; বল্‌লে—মাঝি, কে মরেছে? এ কবর কার? মাঝি এ খাল দিয়ে সর্বদা নৌকো বেয়ে আসা যাওয়া করে। খাল ধারের সব খবর জানে সে। বললে—বাবু, এখানে কি একটা কবর? এ উঁচু জায়গাটা ভর্তি কবর; প্রায় দশ বারো জন লোক মারা গেছে সামনের এ মুসলমান বাড়ীটা থেকে; সব না খেয়ে মরেছে। সামনের যে কবরটা দেখছেন, এখানে মবতালী মিঞাকে মাটি দেওয়া হয়েছে; বুড়ো বয়সে মিঞা না খেয়ে মারা গেলো।

দেবপ্রসাদের চোখের সামনে জেগে উঠলো দশ বছর আগের এই মবতালীর কথা। এ গাঁয়ের একই পাড়ায় তাদের বাড়ী। দেবপ্রসাদ

তখন খুব ছোট; কিন্তু আজও সব কথা স্পষ্ট মনে আছে। দেবপ্রসাদের বাবা ছিলেন একজন বড় দরের পাট ব্যবসায়ী। গ্রামের পর গ্রাম ঘুরে' মুসলমান গৃহস্থদের বাড়ী থেকে পাট কিনতে এ মবতালীই ছিলো তার একমাত্র দোসর। মণ প্রতি দু' পয়সা কমিশন পেতো সে, তা'তেই তার বেশ দু'পয়সা জমে' উঠেছিলো। বাড়ীঘরের চেহারা হয়ে উঠেছিলো অবস্থাপন্ন মুন্সি সাহেবের মতো। দেবপ্রসাদের পিতাকে উদ্দেশ করে' লোকের কাছে বলতো, ও-বাড়ীর চাচা যতদিন আছে ততদিন মবতালীর ভাতের অভাব হবে না।

সত্য সত্যই দেবপ্রসাদের বাবা যেদিন হঠাৎ কলেরায় মারা গেলেন, এ মবতালীই মৃতদেহের পাশে ধুলোয় লুটিয়ে পড়ে' কেঁদে কেঁদে বলেছিলো, হায় আল্লা! একি করলে! এবার না খেয়ে মারা যাবো যে।

এর পরও প্রায় বছরখানেক দেবপ্রসাদের পিতার শ্মশানের কাছে এ মবতালীকে প্রায়ই একা একা ঘুরতে দেখা গেছে। এমনি ছিলো একজন হিন্দুর ও একজন মুসলমানের এক অন্যের প্রতি প্রাণের আকুল টান, জীবনব্যাপী আকুল নির্ভরতা, আকুল প্রীতি ও ভালবাসা। দু'জনের পৃথক ধর্ম ছিল মিথ্যা; দু'জনের একই মানব হৃদয় ছিল সত্য সুন্দর। আজ এ মবতালীর কবর দেখে' দেবপ্রসাদের চোখে এলো জল। মৃত পিতার ও মৃত মবতালীর উদ্দেশ্যে মাথা নত করে' সে প্রণাম জানালো। বললে, তোমরাই ছিলে বাংলার খাঁটি মানুষ। আজ বাংলার হিন্দু-মুসলমান কত অর্থশূন্য হয়ে পড়েছে।

মবতালীদের বাড়ী বাঁদিকে ফেলে, ডান দিকে ধোপা বাড়ী ও বাউল বাড়ী রেখে নৌকো এসে একটা বকুল ও বটগাছের তলে পৌছালো। খালের তীর ঘেষে' গাছ দুটো জড়াজড়ি করে' দাঁড়ানো। দেবপ্রসাদের গা ভয়ে ছম্‌ছম্‌ করে' উঠলো। এ গাছ দুটো আশ্রয় করে' কি এক ভয়াবহ দেবতা বাস করে। এ গ্রামের লোক নিজেদের মংগলের জন্য

মাঝে মাঝে ঢাক ঢোল বাজিয়ে গাছতলায় এসে পূজো দেয়। গাছের গোড়ায় তেলসিন্দুর মাখে। দেবপ্রসাদও ছোটবেলা ঠাকু'মার সংগে এসে কতবার পূজো দিয়ে গেছে; কত ফুল বেলপাতা গাছের গোড়া থেকে তুলে' নিয়ে ঠাকুরমা তার কপালে ঠেকিয়ে নাতির দীর্ঘজীবন কামনা করেছে। দেবপ্রসাদ আজও ভয়ে ভয়ে গাছ দুটোর দিকে চোখ তুলে' চাইলো; ছোটবেলার সংস্কার সে আজও ছাড়তে পারে নি। শেষে গাছের অজানা দেবতার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানালো। "যার যার বাঁয়"—সম্মুখ থেকে কণ্ঠস্বর শোনা গেলো। দেবপ্রসাদের নৌকোর মাঝিও সাড়া দিলো "যার যার বাঁয়"। কিছুক্ষণ পর সম্মুখ থেকে একখানা নৌকো এসে দেবপ্রসাদের নৌকোর ডান পাশ দিয়ে চলে গেলো। অন্ধকার রাতে নৌকোয় নৌকোয় কোন ঠোক্কর লাগলোনা। বেশ সুন্দর সহজ গতিতে নৌকো দু'খানা নিজ নিজ বাঁ দিক্ ধরে চলে' গেলো। শহরের "কিপ্ টু দি লেফট্" কথাটা দেবপ্রসাদের মনে পড়লো; দেবপ্রসাদ শিউরে' উঠলো; দিনরাত শহরে তবু কত মোটর একসিডেণ্ট। উচ্ছৃংখল সমস্ত শহর; শহরের সমস্ত যানবাহন; সমস্ত পাশ্চাত্য লীলাভংগী।

দেবপ্রসাদ খালের জলের মধ্যে হাত ডুবিয়ে দিয়ে আঁজল ভরে' জল তুললো; চোখের সামনে ধরে' বললো কি সুন্দর টলমল করছে; হাতের জলের আয়নার ভেতর দিয়ে চাইলো; আকাশের তারাগুলি চোখের সামনে ঝলমল করছে যেন। একটা কলমীদলে নৌকো ঠেকলো; কলমী ফুলগুলি সুন্দর ফুটে রয়েছে; দেবপ্রসাদ হাত বাড়িয়ে একটা ফুল তুলে' এনে নাকের কাছে ধরলো, গন্ধ নেই। হঠাৎ ফুলের বুকে আলো জ্বলে' উঠলো। দেবপ্রসাদ চম্‌কে' উঠে ফুলটা জলে ফেলে দিলো। একটা জোনাকী আলো জ্বেলে' জ্বেলে' উড়ে' চলে গেলো। শহরে তার ঘরের বিজলী বাতিটা এতদিন তাকে জ্বেলে পুড়ে দিয়েছে যেন—দেবপ্রসাদ ভাবলো।

খাল ছাড়িয়ে এবার নৌকো এসে দীঘিতে পড়লো; দক্ষিণ তীরে আমবাগানের ভিতরে ছোট বাড়ীখানাই দেবপ্রসাদের। দেবপ্রসাদ সেদিকে চাইলো, কি আকুল ব্যগ্র উল্লাস ভরা চাহনি। এতদিন পর "মাই স্থইট্ হোম্" দেবপ্রসাদ ভাবলো। আমবাগানের স্নিগ্ধ শীতল মায়াময় আঁধারটুকু যেন তাকে নাম ধরে' ডাক্‌লো—দেবু এসো, বাড়ী এসো।

নৌকো এসে ঘাটে লাগলো। দেবপ্রসাদ তীরে ভিজা মাটির উপর নেমে' পড়লো। খালি পা, পায়ের তল যেন জুড়িয়ে গেলো। স্নিগ্ধ শীতল দেশের মাটি। শহরের পাষাণ-গাঁথা তপ্ত ফুটপাথ পাষাণ করে' দেয় সর্ব প্রাণ। দেবপ্রসাদ ঘরে এসে ঢুকলো, মা আকুল অধীর ললাটে চুম্বন এঁকে দিয়ে বললেন—এসেছিস বাবা, এতদিন পর! চোখ দু'টী তাঁর আকুল স্নেহ-বন্যায় ভেসে' উঠলো।

সম্মুখের জানালাটা খোলা। রাত্রি দশটা। গভীর নিদ্রা-নিমগ্ন চারিদিক। নিবিড় নিস্তব্ধ। প্রাণ আকুল-করা স্নিগ্ধ নীরব নিবিড় অন্ধকার। অংগ শীতল করা আঁধার সমুদ্রের মৌন পরশ। পল্লীমায়ের নীরব নিবিড় নিদ্রামগন স্নেহময় মুখখানি দেবপ্রসাদের চোখের সাম্‌নে ভেসে উঠলো; শান্ত সুনিবিড় পল্লীমায়ের আঁচলখানি যেন আকাশের অন্ধকারে উড়ছে; সে আঁচলের সূক্ষ্ম গ্রন্থির ফাঁক দিয়ে দেখা যায় শত নক্ষত্রের আলোর দীপশিখা; পৃথিবীর অন্ধকারে দূরের শুভ্র আলো। দেবপ্রসাদের মনে হ'লো—শহর থেকে বহুদূরে এ পাড়াগাঁয়ে এসে বংগ-জননী নিভৃত ছায়া-স্নিগ্ধ গৃহকোণে অক্ষত দেহে বাস করে। শহরে তার বিদেশী মিলিটারী গাড়ীর চাপে ক্ষত বিক্ষত সকল অংগ। নয়নে তার সংগ্রাম-পীড়িত অসহ্য অশ্রুজল।

দেবপ্রসাদ জানালা দিয়ে চেয়ে আছে। একটু দূরেই একটা কুলগাছ, ডালগুলি তার চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। কচি সবুজ নরম পাতায় গাছটা

আকুল জীবন্ত। ফাগুন চৈত্র মাসে প্রখর রৌদ্রের তাপে গাছটা শুকিয়ে মরে' যায় যেন; ছিন্নচ্যুত সকল পত্র। আষাঢ়ের বর্ষা আসে নব ধারা নিয়ে, গাছটা আবার ভরে' উঠে নব রসে। দেবপ্রসাদ কি যেন দূরের মায়ায় গাছটার দিকে চেয়ে আছে। বহুদিনের পুরাতন এ কুলগাছটা। ছোটবেলায় দেবপ্রসাদ এ গাছটায় উঠে কত কুল খেয়েছে। কুলগুলি বেশ মিষ্টি রসে ভরা। গাছের কাঁটায় সমস্ত অংগ ক্ষত বিক্ষত হয়ে গেছে, কিন্তু তবু কুল মিষ্টি, কাঁটার আঁচর নয়, সর্বাগে রসের প্রবাহ। নীচে গাছতলায় দাঁড়িয়ে থাকতো আভা, ছোট্ট মেয়ে; পাশের বাড়ীর। বলতো—দেবুদা, আমায় একটা কুল ফেলে দিন।

দেবপ্রসাদ বলতো, উঠে আয় না, নিজ হাতে পেড়ে খাবি।

—কি যে বলেন, আমি কি গাছে উঠতে পারি? ভয় করে। আপনার দু'টি পায়ে পড়ি, একটা ফেলে দিন।

দেবপ্রসাদ তিন চারটে কুল নীচে ফেলে দিতো। আভা কুড়িয়ে নিয়ে উপরের দিকে চেয়ে আবার বলতো—এখন নেমে আসুন, পড়ে' যাবেন কিন্তু! ভয় করেনা আপনার? কি কোমল মায়াময় কচি কণ্ঠস্বর! দেবপ্রসাদ একটা গভীর নিশ্বাস টান্‌লো। সেই সরল সুন্দর স্বাধীন অলস ছোটকাল। সেই ভাবনা যাতনা বেদনা-বিহীন কুলগাছ আজ কত কণ্টকময়, কত বেদনাময় বলে' মনে হয়! সেইদিন আর এইদিনে কত ব্যবধান। আজ একমুষ্টি ভাতের জন্য সেই সকাল দশটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত অফিসে কি হাড়ভাংগা পরিশ্রম করতে হয়; এক মুহূর্ত বিশ্রাম নাই। খা খা করে' জল্‌ছে যেন জীবনের চিতা! হু হু করে ছুটে চলেছে যেন জীবনের রক্ত-প্রবাহ! সে ছোটকাল, সে বালক বয়স, আর এ কর্তব্য-কণ্টকময় যৌবন বয়স! সে পৃথিবী আর এ পৃথিবী! কি যেন একটা প্রলয় পরিবর্তন ঘটে গেছে মাঝখানে! Child is the father of man! No I deny it. শিশুর সরল শান্ত হাসি—যৌবনে চঞ্চল

মুখর—বার্ধক্যে শুকনো ঝরা ফুল। সেই আভা কি আজও সেই আভা! কি যেন এক সরল বিহ্বল রাতের অন্ধকার পরশ নীরবে দেবপ্রসাদকে আচ্ছন্ন করে' ফেললো; চোখ দু'টি তার বুজে এলো, ঘুমিয়ে পড়লো সে।

সপ্তাহখানেক পর। কুলগাছটার গা ঘেঁষে একটা শিউলী গাছ। পাঁচ বছর আগে এ গাছটা ছিলো না, ওর বয়স মাত্র তিন বৎসর। যৌবন-বয়সী মেয়ের মতো প্রাণবন্ত এর শাখা-প্রশাখা। তরুণী মেয়ের মতো এ গাছটার অংগ-সুরভি। সুমিষ্ট সুরভি যেন গাছটার ডাল থেকে ঝরে' পড়ছে। শুভ্র শিউলীদলে সমস্ত গাছটা রূপালী হয়ে রয়েছে। শিশির-সিক্ত পুষ্পগন্ধে চারিদিক রোমাঞ্চকর।

উদয় গগনে তখন সবে মাত্র নবারুণের রক্তাভা বিকশিত হচ্ছে; বিহংগকুল তখনো নীড় ত্যাগের জন্য পক্ষবিস্তার করেনি। দেবপ্রসাদ খুব সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে মায়ের আদেশে তুলসীতলায় প্রণাম করে। আজ তুলসীমূলে প্রণাম করতে এসে দেখে, শিউলীতলে কে সাজি ভরে' ফুল তুলছে।

—আভা না? দেবপ্রসাদের চোখে বিস্ময়ের মধুর পরশ। সেই আভা আজ এই আভা হয়েছে! বিকশিত অংগ হতে যেন যৌবন-লাবণ্য ঝরে' পড়ছে! শেফালির মতো শুভ্র হয়ে যেন ফুটে উঠেছে ওর সর্বাংগ। দেবপ্রসাদ কম্প্র বক্ষে নম্র পদে ওর কাছে এসে দাঁড়ালো। আভা ফুল কুড়াতে কুড়াতে বললো—কে দেবুদা'? শুনছি আপনি ক'লকাতায় চাকরী করেন, কবে এলেন?

—সপ্তাহখানেক।

—কবে যাবেন?

দেবপ্রসাদ বিস্ময়ে নীরব দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন আভার দিকে। মুগ্ধ তার দুটি আঁখিতে সহসা জেগে উঠলো রহস্যময় জীবন-শিখা। কুলতলার সেই ছোট আভা! সরল, সুন্দর, লজ্জাহীন, উন্মুক্ত, অনাবৃত,

সেই মধুর অংগ আজ এমন সুসজ্জিত, পরিস্ফুট, লজ্জিত, সচকিত, কম্পিত, কুন্ঠিত ? সেই সেদিনের সরল সুন্দর অবারিত দেহে কণ্টকিত যৌবনের আজ একি আরক্ত আবরণ; একি লজ্জারাঙা শিহরণ! উন্মুক্ত উদার মুক্তির মাঝে একি কারারুদ্ধ বন্ধন-বেদনা।

আভাও মুখ তুলে' দেবপ্রসাদের চোখের দিকে চাইতে পারলো না। নম্র নত নয়নে সে ভাবলো সেই কুলগাছের ক্ষত-বিক্ষত দুরন্ত অশান্ত চঞ্চল বালক দেবুদা' আজ এমন বিকশিত, সুন্দর শান্ত শ্যামকান্তি-উজ্জ্বল-জ্যোতিস্নিগ্ধ ? কিন্তু নয়নের সেই সরল সুন্দর স্নিগ্ধ আলোকে আজ এ কিসের চিত্তস্পর্শী প্রখর কিরণ? সেদিনের দৃষ্টির কাছে আজকার দৃষ্টির একি পরিবর্তন! সহসা আমার বুকে একি বিপুল বেদনা ভরা সুন্দর পুষ্পকোমল আঘাত? আভা শেষে মুখ তুলে' বললো—শুনছেন আমার কথা ? আবার কবে ক'লকাতা যাবেন ?

—সপ্তাহ তিনেক পর।

—এতদিন পর এসে আবার এত সকালেই যাবেন ?

—কালের বিপুল পরিবর্তনের মাঝে টিকে থাকা যায় ক'দিন? বিপুল প্রশ্ন। আভা কিছু বুঝে, কিছু না বুঝে শিউরে' উঠলো।

পূর্ব গগনের উদয় তোরণে অরুণ-আলো তখন রক্তরাঙা হয়ে উঠেছে। প্রভাতীবায়ুর মৃদুমধুর স্পর্শ-সঞ্চালনে শিউলী ফুলগুলি আভা ও দেবপ্রসাদের অংগে ঝরে' পড়তে লাগলো। দু'জনেই হারিয়ে গেল এক শুভ্র সুদূরে। কিছুক্ষণ কাটলো এ ভাবে। শেষে আভা অশ্রু-টলমল সুন্দর চোখে দেবপ্রসাদের দিকে চেয়ে বললো—সত্যি আবার চলে' যাবেন ? না গেলে হয় না ?

দেবপ্রসাদ সহজ কণ্ঠে বললো, না—যেতেই হবে। এই তো আমাদের বাস্তব পৃথিবী! এর এই কঠিন আবরণের অন্তরালে প্রবাহিতা যে অশরীরি প্রেমের মাধুর্য্যধারা তাইতো এই পৃথিবীকে সরস আর স্বপ্নময় করে রেখেছে। সেইখানেই আমাদের পরিচয়ের সার্থকতা আর তৃপ্তি।

নারীর উক্তি

আজ এ ষাট বৎসর বয়সের মুখখানা আয়নার ভিতর দিয়ে দেখে থর থর করে' কেঁপে উঠে বুক। কি যেন মৃত্যু-বিভীষিকায় বুঁজে' আসে দু'টী চোখ। প্রলয়-কালের কি যেন এক ঘন অন্ধকার সম্মুখের দৃষ্টি তোলে কাঁপিয়ে। সমস্ত মুখের উপর, সমস্ত চোখের উপর দিয়ে কত বড় ধ্বংস-প্রবাহ যেন ছুটে চলে' গেছে: কি যেন নিদারুণ কঠোর আঘাতের কঠিন দাগ ফুটে উঠেছে সারা দেহে: শত ক্ষতচিহ্ন রেখে গেছে দেহের প্রতি কোণে: দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর চলে' গেছে ঘাত-প্রতিঘাত করে' এ দেহখানি। কালের পাষাণ অংগুলির আঘাতের সুস্পষ্ট রেখা ফুটে রয়েছে যেন হিয়ায় হিয়ায়। মহাকালের মহাসংগ্রাম যেন বিষবস্ত করে' দিয়েছে এ মুখ, এ চোখ, এ কপোলতল—এ দেহ, এ দেহের প্রতি অংগ। কালো কালো রেখায় সর্বাংগে লিখে' দিয়েছে মানবজীবনের বার্ধক্যের দারুণ পরিণাম। ষাট বছরের মুখখানির দিকে চেয়ে আজ বার বার এই কথাই মনে হচ্ছে।

যৌবনের সেই প্রদীপ্ত প্রাণ-বহ্নি আজ নির্বাপিত। বসন্তের সেই পুষ্প-উৎসব আজ ভীষণ ঝরাফুলের মৃত্যু-নীরবতায় ভরা; সর্ব অংগে যেন আজ অন্তহীন মৃত্যুগন্ধ: মৃত্যুর কালো ছায়া আজ সর্বাংগে: এমন কি বসনে ভূষণে পর্যন্ত। আজ মুখের সে লাবণ্য কোথায়? চোখের সেই নীলাভ দ্যুতি কোথায়? সেই চারু-সুন্দর নম্র আঁখি-পল্লব? পুষ্প-কোমল অধরের সেই রক্তরাগ? সেই দীপ্ত কপোলতল; সেই চামেলী-সুন্দর চোখ-চাহনি? বন্ধুরা চোখ দু'টী দেখে কত হিংসা করতো; বলতো এমন দু'টী চোখ যার তার কাছে বন্দী হয় সকল বিশ্ব; ঐ দু'টী চোখের চাহনির মধুস্পর্শে চঞ্চল হয় শত শত পুরুষ-চিত্ত; ঐ কাজল ভুরুর মায়ায় মুকুলিত হয় কত পুরুষের প্রেম-পুষ্প। শুনে' সলজ্জ আনন্দের হাসি হাসতাম; অন্তর ভরে' উঠতো

গৌরবে; হয়েছি বিপুল সুখী। কে না হয়? কালো কুৎসিতাকেও সুন্দরী বললে—সেও হয় সুখী। কিন্তু আমি ছিলাম প্রকৃতই সুন্দরী। আঠারো উনিশ যখন আমার বয়স তখন আমি নাকি ছিলাম আমাদের কলেজের মেয়েদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা সুন্দরী; আমার সকল অংগে ছিলো রূপ ও যৌবনের বসন্ত-উৎসব; ফাগুনের পলাশকলিকা আগুন জ্বালতো আমার সমস্ত বসনে ভূষণে, আবরণে, আভরণে। লক্ষ মুদ্রার মণি-মুক্তার হার দুলতো আমার চারু-কণ্ঠদেশে; একমাত্র কন্যা ছিলাম কোটীপতি আমেরিকাবাসী পিতার। আমায় দেখে বন্ধুরা হেসে বলতো—স্বর্গ থেকে নেমে' এলি বুঝি? এত রূপ মর্ত্যে সইবে না; যা আবার স্বর্গে চলে যা। ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী হয়ে থাক গিয়ে।

দেখতাম, কলেজের ছেলেরা আমার সাম্‌নে অতুল সম্ভ্রমে থাকতো: দূরে সরে' দাঁড়িয়ে আমায় পথ ছেড়ে দিতো। তাদের লজ্জা-সুন্দর নয়ন নত হয়ে পড়তো আমার নারী-মাধুর্যের সম্মুখে; করতো তারা আমাকে শ্রদ্ধা, দেখাতো দেবীর সম্মান। গৌরবে আমার মন ভরে' উঠতো, সগৌরবে আমি তাদের মংগল-কামনা করতাম। তাদের ভবিষ্যজ্জীবন শরৎ-লক্ষ্মীর আগমনী-সংগীতে ভরে' দিতে চাইতাম নিজে দেবীর বেশ ধরে'; নিজে ওদের কল্যাণময়ী ভগিনী হয়ে। তাদের সাথে আমার যেন শেষে একটা পবিত্র বন্ধন দিন দিন দৃঢ় হয়ে উঠলো; কি যেন একটা স্বর্গীয় শোভা ফুটে' উঠতে লাগলো তাদের মুখে চোখে। দেখতাম, তারা যেন সত্য সত্যই শক্তির উপাসক; কল্যাণময়ী নারীর বীর ভক্ত। সুদৃঢ় চরিত্র-সৌন্দর্যে সবাই যেন দেব-অংগের মহিমাপ্রাপ্ত। ভেবেছি—এরাই হবে ভবিষ্যৎ ভারতের বীর ভগিনীর বীর সহোদর।

কে বলে ছেলেমেয়ের একত্র মিলনে নৈতিক চরিত্রে দুর্বল কম্পন জাগে? সমাজ-চরিত্রের বিঘ্নের হয় অদৃশ্য উদ্ভব? কলেজে যেখানে মেয়েরা শক্তিময়ী, কল্যাণময়ী ভগিনীরূপে, ছেলেদের বক্ষ সেখানে নিজ

ভগিনীর, নিজ জাতীয়, নিজ দেশের সম্মান রক্ষার প্রেরণায় নবশক্তিতে জেগে উঠে। যেখানে এ নিয়মের বিশৃঙ্খলা ঘটে, বুঝতে হবে মেয়েরা সেখানে অস্বাস্থ্যকর রুচির গুপ্ত-উপাসিকা: প্রকৃত শক্তির অধিকারিণী হ'তে পারে নি। দেশ, সমাজ, জাতি তখনই মংগলময় স্বাস্থ্যসম্পন্ন, যখন মেয়েরা বীররমণী—শিক্ষা দীক্ষায়, মেলামেশায়, আদানে প্রদানে। ছেলে মেয়ে যেখানে একত্র জীবনের সুন্দর রূপ, সেখানে প্রস্ফুটিত, সুবাসিত; ফলে ফুলে বিভূষিত; মানব জীবনের পূর্ণ পবিত্র সংগীতের সুর সেখানে মুখরিত, ধ্বনিত, প্রতিধ্বনিত। বিশ্ব সেখানে জেগে উঠে মানব জীবনের পূর্ণবাণী নিয়ে। পুরুষের পবিত্র সংস্পর্শে নারী হয় কল্যাণময়ী; নারীর পবিত্র সংস্পর্শে পুরুষ হয় প্রকৃত মনুষ্যত্বে বিকশিত; প্রকৃত শক্তির অধিকারী; অনন্ত জীবনের ঐশ্বর্যে ঐশ্বর্যবান। কুমুদের বুকে কৌমুদীর মতো চির পবিত্র রূপ ও আলোকরশ্মিতে দীপ্যমান। পুরুষকে বাদ দিয়ে নারীর মহিমা দীপ-নিভে-যাওয়া নিশীথ রাতের আঁধার মন্দির সম; জীবনের ঠাকুর সেখানে অন্ধকারে লুপ্ত। আবার নারীকে বাদ দিয়ে পুরুষের মহিমাও তেমনি রাহুগ্রস্ত অরুণের মতো কলংকময়। হোক পুরুষ দীপ্যমান জ্যোতির অধিকারী, কিন্তু নারী সম্মুখে দাঁড়িয়ে তার কল্যাণময় অপূর্ব রূপ শক্তি বরণ না করলে তার সমস্ত জ্যোতিঃ হয় রাহুগ্রস্ত, নির্বাপিত, অলংকৃত। স্ত্রী-পুরুষের বিশুদ্ধ মিলন-যজ্ঞেই জীবন হয় অনন্ত মধুর, চারু স্নিগ্ধ, শান্ত সুশীল।

আমিই গড়ে' তুলেছি একজন দেশনেতা শ্রেষ্ঠমানব, যার নাম কখনও প্রকাশ করবো না। আমার মতো মায়ের জাতই গড়ে' তুলেছে রবীন্দ্রনাথ, জগদীশ, গান্ধী, জহরলাল—জগদ্বিখ্যাত মানব যাঁরা।

আমারই সহপাঠী ছিল সে। তার শক্তি ছিল অনন্ত; সে ছিল জ্যোতির্ময় পুরুষ। তার সেই সুপ্ত শক্তি-জ্যোতিকে আমিই ইন্ধন

যুগিয়ে জীবন্ত ও প্রজ্জ্বলিত করে' রেখেছি চিরকাল। সে আমাকে শ্রদ্ধা করতো, সম্মান করতো, সম্ভ্রমে দূরে সরে' দাঁড়াতো। সে আমার নারীশক্তিকে আরাধনা করতো, পূজা করতো আমার নারীত্বকে। আমিও শেষে তাকে চিনতে পারলাম—অসীম শক্তিসম্পন্ন একজন যুবক রূপে। ভাবলাম, এ যুবকই হবে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বীর, সম্মানযোগ্য, বিশ্ব-পূজ্য। মেয়েদের যে কল্যাণময়ী রূপে দেখে, শক্তিময়ী রূপে পূজা করে, সে কল্যাণময়ী নারীই দেয় তাকে শক্তি, সাহস; মধ্যাহ্ন অরুণ-জ্যোতিঃ জ্বালে তার ললাটে রাজটীকা।

যে কথা জীবনে কোনদিন প্রকাশ করবোনা ভেবে সুদূর আমেরিকায় চলে' এসেছিলাম; জীবনের যে প্রেম-মাধুর্য আপন প্রাণের গুপ্তবাসে সযত্নে ঢেকে' রেখেছিলাম, জীবনের যে পূর্ণ অভিনয় শুধু আমার অন্তরেই পূর্ণ জ্যোতিঃ নিয়ে গুপ্ত থাকতো চিরদিন, আজ তা জগতের সম্মুখে প্রকাশ করে' যাবো। আজ আমার এ ষাট বছরের মন সকল বন্ধনহারা হয়ে উঠেছে, প্রাণের সকল গুপ্ত অভিনয় বিশ্ব-মঞ্চে প্রকাশিত হ'তে চাইছে। আজ সর্ব দ্বিধাহীন হয়ে জগতের সম্মুখে বলবো—সেই ছিল আমারই উপাসক।

আজ ভেসে' উঠেছে সেই পুরাণো দিনের অরুণ-দীপ্ত স্মৃতি। ভেসে উঠেছে সেই লেকের ধারে জ্যোৎস্না-যামিনী, সেই কৃষ্ণচূড়ার রাঙা গুচ্ছ, রক্ত-উদ্দীপক আমাদের দু'জনের কথোপকথন। চৈত্রের মধু যামিনী; চৈতালী হাওয়া চঞ্চল হয়ে বইছে দিগন্তরের চিত্ত চঞ্চল করে'। আমি আর সে একটা কৃষ্ণচূড়ার তলে শ্বেতপাথরের বেঞ্চে বসে থাকতাম। মাথার উপরে বহু উর্ধ্বে নীল নৈশ-আকাশ তারকাদীপ্ত আলোকে উজ্জ্বল; তার বহু নীচে কৃষ্ণচূড়ার আন্দোলান ছায়া। এ জগতে আর ঐ জগতে মিলে যেন গভীর মিলন-সম্ভাষণ। তার চিত্তে আর আমার চিত্তে তেমনি যেন একটা মিলন-আয়োজন; মিলিত সংগীত

সুর। কিন্তু গভীর নীরব; স্তব্ধ মৌন সে সংগীত। আমাদের দু'জনের মিলিত আঁখি; দীপ্ত চাহনি-সুষমা; অসীম অন্তরতল; অসীম অফুরন্ত ভাষা বুকের নিভৃত গহনে। কিন্তু দু'জনারি মুখ অতল নীরবতায় মৌন; মুখে নেই কোন ভাষা, কিন্তু অধরতল নীরব স্পন্দন-মুখরিত। কি যেন একটা দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, সন্দেহ সংশয় দু'জনকেই জড়িয়ে রয়েছে। তাই কিছু বলতে পারছিনা, শুধু দেখতে পাচ্ছি, বুঝতে পাচ্ছি, দু'জনই দু'জনকে। কি যেন একটা বহুদিনের না-বলা কথা তাকে চঞ্চল করে' তুলেছে। বললে—দেবি, এ জীবন যেন শুধু তোমার দিকে চেয়েই অপেক্ষা করে' রয়েছে। তোমার রূপ-প্রেরণার প্রবাহেই যেন আমি দিনরাত ছুটে চল্‌ছি—জানিনা কোথায়, কি উদ্দেশ্যে।

বললাম—হাঁ, আমিই তোমার ভাগ্য-বিধাত্রী। আমি তোমাকে প্রেরণা দিচ্ছি তোমার অসীম জীবনের পথ প্রান্তে দাঁড়িয়ে।

বললে—হাঁ, সত্য সত্যই তোমার ঐ পবিত্র নারী-রূপ আমাকে দিনরাত শক্তিগামী করে' তুলছে। কি যেন একটা পরম পবিত্র জাগরণ কেঁপে উঠেছে আমার এ রক্তপ্রবাহে। আমি কি দেখছি জানো—আমি যেন দেখছি তুমি চির-জ্যোতির্ময়ী, অনন্ত শক্তিরূপিনী। চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্র যেন তোমার ঐ দুটি আঁখিনীল-নভে জ্বল্‌ছে; সমস্ত জ্যোতিষ্ক-সমাজ যেন তোমার ঐ নয়ন-আকাশে পুঞ্জীভূত ঔজ্জ্বল্য নিয়ে জ্বল্‌ছে; সমস্ত বিশ্বপ্রবাহ যেন তোমার সারা অংগে উন্মত্ত অধীর। দেবি, সত্যই কি তুমি চির শক্তিময়ী? সত্যই কি তুমি আমার বুকে বিশাল আসন পেতে?

বললাম—হাঁ, আমি তোমার চিত্ত জয় করেছি; তুমি করবে বিশ্ব-চিত্তজয়। যাও, দুঃখ-পীড়িত, বেদনা-দলিত কাতর ভারত তোমাকে ডাকছে। হও তার তেজস্বী বীর-পুরুষ। তোমার চরণ-তলে কেঁপে উঠুক সমস্ত পৃথিবী। বললে, কিন্তু তোমার ঐ জ্যোতির্ময়

রূপের আড়ালে আবার দেখছি তোমার সেই কুসুম-কোমল নারী-অংগ-সুলভ চিত্ত-চঞ্চল করা যৌবন-রাগ ; এ দুর্বলতা কেন ? কি যেন এক অহিতকর বাঞ্ছায় কেঁপে উঠে বক্ষস্থল।

বললাম—এ সকল পুরুষের পক্ষেই খুব স্বাভাবিক। নারীর কাছে নর হয় ক্ষণিকের জন্য দুর্বল, দীন, তখন এ নারীই আবার শক্তিময়ী রূপ ধরে' সেই দুর্বল মুহূর্তকে শক্তিপুঞ্জ করে' দেয়। পুরুষ যেখানে দুর্বল নারী সেখানে বিশাল বিশ্বের পুঞ্জীভূত শক্তি নিয়ে সম্মুখে দাঁড়ায়। এখানেই সৃষ্টির পূর্ণ মাধুর্য ; তা না হ'লে বিশ্ব-সৃষ্টি এতদিনে লোপ পেয়ে যেতো। ভয় নেই, তোমার এ দুর্বলতার অপর নাম শক্তিহীন প্রেম ; যা সাধারণ মানুষের, রুগ্ন যার অভিরুচি, পরিণাম যার বিবাহ-বন্ধন। কিন্তু তোমার আমার প্রেম হবে অসীম-শক্তি-সম্পন্ন ; বিশ্বের কল্যাণরূপে। স্বামী স্ত্রী হয়ে বিশ্বের অকল্যাণ অবাঞ্ছিত রুগ্ন শিশুদের জন্মদাতা রূপে নয়। তুমি হবে কল্যাণময়, এই তোমার ললাটে দিলাম শক্তির রাজটীকা। বলে' তার ললাটে অংগুলি স্পর্শ করলাম। বললাম—যাও বীর, সম্মুখে তোমার রুগ্ন পীড়িত অর্ধমৃত ভারত, তাকে নবীন প্রাণমন্ত্রে দীক্ষিত করো ; পালন করো তার আদেশ। আজ আমি চলে' যাচ্ছি বহুদূর, সুদূর আমেরিকায়। আমার পিতা সেখানে বিখ্যাত দার্শনিক ; একটা কলেজের অধ্যাপক। আমি তাঁর কাছে দর্শন পড়বো। বিবাহ যে সমাজে শুধু দৈহিক মিলনের আকাংখা, সে বিবাহ আমি ঘৃণা করি। আমার প্রেম শক্তি-উদ্দীপক ; সে প্রেমই আজ তোমাকে দিয়ে যাচ্ছি। যাও বীর ; বীর বেশে পালন করো ভারত বিশ্ব। তোমাকে যে নারী বিবাহ করবে, সে তার রূপ দিয়ে, তার অংগ দিয়ে তোমাকে সেবা করে' হবে সন্তানের মা। আর আমি আমার নারীশক্তি দিয়ে গড়ে' তুলবো তোমার মতো বিরাট পুরুষকে। শক্তির পূজারী হবে সে, ভারত হবে যার জন্য গর্বিত ; আমার রূপ, আমার প্রেম, আমার ভালবাসা হবে

শক্তির জন্মদাতা, জননী হব মহাশক্তির। বলে' চলে' এলাম আমেরিকায়, পিতার হলাম শিষ্যা, অধ্যয়ন করলাম—নারী ও সৃষ্টি; খুঁজে' পেলাম নারীর স্থান।

তারপর কেটে গেছে বিশ বছর। একদিন শেষে সেই সুদূর আমেরিকার একটা ক্ষুদ্র শহর থেকে শুনতে পেলাম—সত্য সত্যই আমার সেই সহপাঠী আমারই নারীশক্তির প্রেরণার মাঝে খুঁজে' পেয়েছে বিশ্ব-শক্তি; হয়েছে ভারতশ্রেষ্ঠ বীর। নিজকে ধন্য মনে করলাম আমার সেই চিরবাঞ্ছিত বীর প্রেমিকের দিকে চেয়ে। সেদিন আমার নারী-শক্তিকে মেনে নিলাম। সে আমার নারীত্বের মাঝেই পেয়েছে অনন্ত শক্তির গিরি-প্রস্রবণ। তার অতল-স্পর্শী চোখ দু'টী খুঁজে পেয়েছে আমার প্রেমের মাঝে বিশ্ব-প্রেম; আমার রূপের মাঝে বিশ্ব-রূপ; আমার শক্তির মাঝে বিশ্ব শক্তি। তাই সে জয় করেছে বিশ্ব-চিত্ত; হয়েছে সর্বশ্রেষ্ঠ ভারত-নেতা। তার সংস্পর্শে সার্থক হয়েছে আমার নারীত্ব; আমার সংস্পর্শে সার্থক হয়েছে তার পুরুষত্ব। আজ আমি ষাট বছর বয়সে উপনীত হয়েছি; জরা-জীর্ণ সব তনু; মৃত্যু ধ্বংস-প্রবাহ নিয়ে আমার সর্বাংগে বিরাজিত। আজ আমার সেই রূপ, সেই যৌবন, সেই মোহিনী মূর্তি, অংগের সেই স্মিত জ্যোতিঃ কিছুই নাই।

আজ আমার এ ষাট বছর বয়সের নারীত্ব-শক্তিকে অভিনন্দন করছি এই বলে যে, আমার দেহ ছিন্ন চ্যুত হ'লেও তুমি শক্তি বেঁচে থাকবে প্রতি নারীতে; প্রতি বীর পুরুষে, প্রতি বিশ্বের উত্থান পতনে।

স্পাই

শাহারাণপুরের একটা ষ্টেশনে গাড়ী ফেল করে' বসলাম। যাবো হরিদ্বার, বিকেল পাঁচটায় একখানা মাত্র গাড়ী সারাদিনে। সময় মতো এসে ধরতে পারলাম না।

সামনে সুদীর্ঘ রাত্রি; এখন যাই কোথা? ষ্টেশনে রাত কাটাবার কোন ব্যবস্থা নেই। ছোট্ট ষ্টেশন, ঝড়ের বেগে বহুদূর হ'তে গাড়ী আসে; দু' মিনিট থাকে, আবার প্রলয় বেগে চলে' যায়। পেছনের কান্না শোনবার সময় নেই; ষ্টেশন মাষ্টারকে বললাম। এখানে রাত্রি-বাসের কোন ব্যবস্থা আছে মশায়?

—নিশ্চয় আছে। ওদিকটায় ধর্মশালা রয়েছে। ওদিকে যান, থাকবার বেশ বন্দোবস্ত আছে। তবে চার্জ একটু বেশী।

—কত?

—একখানা রুম, ডেলি দশ টাকা। খাওয়ার ব্যবস্থা নেই; শুধু থাকা যাবে।

বললাম—তা' হোলে খাবো কোথায়?

—সাম্‌নেই আর একটা হোটেল আছে: মাছ মাংস যা চান সব পাবেন।

ধর্মশালার দিকে পা বাড়াতেই সহসা একটি মেয়ে এসে বল্‌লে—দেখুন, আমিও গাড়ী ফেল করেছি, আমিও আপনার সংগে ধর্মশালায় যাব; আমি একা, সঙ্গে কেউ নেই; ট্র্যাভেল করতে বেরিয়েছি যদি দয়া করে ধর্মশালায় নিয়ে যান!

মেয়েটির কাঁধের উপর গোলাপী ওড়না উড়ছে; পরণে শালওয়ার; গায় পাঞ্জাবী। স্বাস্থ্য ও যৌবন সর্বাংগে প্রচুর। আমি ধুতি-পাঞ্জাবী-

পরা বাংগালী। হরিদ্বারের যাত্রী—ধর্ম-অনুসন্ধানে নয়, দেবতার জন্য প্রাণ তখনো কাঁদে না। কলেজে পড়ি, গ্রীষ্মের ছুটী, বাবার টাকা আছে, ছুটীটা তাই বেড়িয়ে কাটাবার জন্য বেরিয়েছি।

বিস্মিত কণ্ঠে বললাম—আপনার নাম?

বললে—সুন্দরী।

ওর দিকে চেয়ে মুগ্ধ হ'লাম: বললাম—বেশ, চলুন তাহ'লে, আজকের রাতটা ধর্মশালায় কাটানো যাক, কাল আবার গাড়ী ধরা যাবে।

রাজপুরীর মতো ধর্মশালা, রাজকক্ষের মতোই ঘরগুলি আভিজাত্য-পূর্ণ! দশ টাকায় একখানা ঘর খুব সস্তা বলেই মনে হ'লো। সুন্দরী একখানা ঘর ভাড়া নিলে, আমি আর একটা ভাড়া নিচ্ছিলাম দেখে সে বল্লে, মাত্র একটা রাত, আপনার আর একটা ঘর নিয়ে কি দরকার? আমার এ ঘরেই একটু জায়গা করে' নেবেন; মিছিমিছি আরো দশটা টাকা খরচ করতে যাবেন কেন? অবশ্য আপনার যদি কোন অসুবিধা না হয়!

বললাম—কিন্তু কথা তা তো নয়। দু'জনেই বাংগালী অথবা পাঞ্জাবী হ'লে লোকে ভাবতো ভাই বোন অথবা স্বামী স্ত্রী। কিন্তু এখানে আমি বাঙালী আর আপনি···

—আমি পাঞ্জাবী। কাজেই এখানে সম্পর্কটা সন্দেহজনক। সুন্দরী হাসলো। সম্পর্কটা যাতে সম্ভব হয় তাই করি, বলে নিজের সুটকেশ খুলে' শাড়ী, ব্লাউজ বের করে' পরলো, তারপর হেসে বললে—দেখুন তো ঠিক মানিয়েছে কিনা?

—বেশ মানিয়েছে আপনাকে বাংগালী পোষাকে। কিন্তু একটা বিষয়ে আশ্চর্য হচ্ছি, আপনি পাঞ্জাবী হয়েও বেশ বাংলা বলতে পারেন তো! আর বাংগালী পোষাকও আপনার সঙ্গে আছে দেখতে পাচ্ছি, এর মানে কিছু বুঝতে পাচ্ছি না তো!

সে হেসে বললে—বাংলাদেশে জন্ম কিনা, তাই। তা'ছাড়া আমি নানা দেশে ট্র্যাভেল করি, সব দেশের পোষাক-পরিচ্ছদ পরি, সব দেশের ভাষা জানি, এমন কি জাপানী ভাষা পর্যন্ত। বলতে বলতে সুন্দরী আমার বিছানাটা খুলে' আমার খাটের উপর পেতে দিলে, তারপর বললে, তা হ'লে আসুন, খাওয়াদাওয়া শেষ করে' শুয়ে পড়ি। আমার এখন বাংগালী পোষাক পরা, সম্পর্কটা সোজা হয়েছে, সংকোচের কোন কারণ নেই ?

কিন্তু কি যেন সংকোচে ও সন্দেহে আমার বুক কেঁপে উঠলো। এ কে ? নানা দেশে ট্র্যাভেল করে ? নানা ভাষা জানে ? নানা দেশের পোষাক পরে ?—নানা প্রশ্ন আমার মনে।

ওর চুলের খোঁপায় গোঁজা ছিলো একটি ফুল, লাল টুকটুকে। ফুলটা খোঁপা থেকে তুলে এনে আমার ধবধবে পরিষ্কার বিছানার উপর ফেলে দিয়ে বললে—বাসর-শয্যা। মুখে লজ্জাহীন পাতলা হাসি।

ভুলে' গেলাম আমার অস্তিত্ব। চোখের উপর যেন স্বর্গ নেমে এলো। পুষ্প-শয্যা নিজ হাতে যে মেয়ে সাজিয়ে দেয়, সে যেই হোক আমাকে সে যে ভালবেসে ফেলেছে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। আমার বুকের ভিতর তখন বিপুল আনন্দোচ্ছ্বাস, প্রাণের নিভৃত কোণে সুরভিপূর্ণ মদির-আবেশ, সসাগরা পৃথিবীর রাজা যেন আমি ;

মেয়েটির এই প্রেম-নিবেদনে, সমস্ত চিত্ত আমার ভরপুর হয়ে গেলো। ভাবলাম, ঘর ভাড়ার টাকাটা যখন সুন্দরী নিজেই দিল, আজকের রাত্রির দু'জনের খাওয়া-খরচটা তখন আমারই দেওয়া উচিৎ।

সামনের হোটেলে গিয়ে দু'জনেই বেশ রিচ্ প্লেট্ নিলাম। বিল এলো। ছ টাকা বারো আনা দিয়ে উঠে এলাম। ঘরে ঢুকে সুন্দরী সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ করে' দিয়ে বললে, সমস্ত পৃথিবীর সন্দেহের

চোখ থেকে এখন আমরা মুক্ত : বলে সে আমার বিছানায় এসে বসলো : বল্‌ল—আপনি শুয়ে পড়ুন, আমি আপনার পাশে বসে থাকি।

অপূর্ব্ব! স্বর্গীয় এ প্রেম! নেশাতুর জাগ্রত দু'টী চোখ নিয়ে শুয়ে পড়লাম। বুকের তলে বিহ্বল-নিঃশ্বাসের আলোড়ন। বিছানার ঐ ফুলটি সুন্দরী আবার তুলে নিয়ে আমার নাকের কাছে ধরলে : বল্‌ল—গন্ধ মধুর জীবন, না? আমি তখন আত্মহারা। ভাব-উদ্বেল কণ্ঠে বল্‌লাম, গন্ধ মধুর জীবন কিনা, তা' জানিনে। কিন্তু আজ এই রাতে যে গন্ধ-নিবেদন করলে, সে যে চিরমধুর। ফুলটা আমার সারা বুকে বুলিয়ে দাও।

বললে—শুধু ফুলের পরশ? আর কিছু নয়?

আমার দু'টী অধরোষ্ঠ থর থর করে' কেঁপে উঠল, ওর অধরপ্রান্তে মিশে। সুন্দরী বল্‌লে—বেশ, এখন ঘুমোও। এ ঘর আমরা ভাঙ্গব না কোনদিন, আমাদের এ নীড় চিরকালের।

পরদিন ভোর না হতেই দেখি পুলিশে আমার ঘর ভর্ত্তি : সঙ্গে সার্জেণ্ট : গর্জন করে' বল্‌লো—কোথায় সে? সে কোথায়? Or you will be shot dead! রিভল্‌বারটা আমার বুকের সম্মুখে। ভয়ে জড়সড়ো হয়ে দু' হাত তুলে দিলাম। কাঁপতে কাঁপতে বললাম—আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না, কার কথা বল্‌ছেন?

সার্জেণ্ট এবার চীৎকার করে' উঠল, আপনার সঙ্গে যে মেয়েটি আজ রাত্রিবাস করেছে সে কোথায়? নিশ্চয়ই সে আপনার স্ত্রী?

রিভলভারের ভয়ে নিজের ও সুন্দরীর অস্তিত্বের কথা একেবারে ভুলে গেছি : এতক্ষণে সুন্দরীর কথা মনে পড়লো। ঘরের চারিদিকে চেয়ে দেখলাম সুন্দরী নাই। ঝরা ফুলের মলিন ব্যথা আমার চোখের তলে। সার্জেণ্টের দিকে চেয়ে আছি।

—সে আপনার কে হয় ?

মুমূর্ষু রোগীর মতো শুষ্ক কণ্ঠে বললাম—আমায় ক্ষমা করুন : সে কে আমি জানি না। বলেছিলো সে একজন ট্র্যাভেলার ; প্রথমে তার পাঞ্জাবী পোষাক পরা ছিলো, পরে বাংগালী পোষাক পরে' আমার ঘরে ঢোকে।

—আপনি এখন কয়েদী। মেয়েটি পাঞ্জাবী নয়, বাংগালী ; জাপানী স্পাই।

এমন সময় ধর্মশালার পাণ্ডা পুলিশের ভিড় ঠেলে এসে বললে, আমার ঘর ভাড়া দশ টাকা ? মেয়েটি বলেছিল, আপনি তার স্বামী ; আপনিই টাকা দেবেন।

পকেট থেকে দশ টাকার একখানা নোট পাণ্ডার হাতে দিয়ে গ্রীষ্মের ছুটিটা শ্রীঘর বাসে কাটাতে গেলাম।

শেষ